শুকতারা

স্বর্ণখনির অন্তরালে

ষট্‌চত্বারিংশৎ বর্ষ
নবম সংখ্যা
কার্তিক • ১৪০০

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা
স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস'
প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী,রমন, বিল্লু,
পিংকী, আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন
এবং আকর্ষণীয় কান্ডকারখানা।

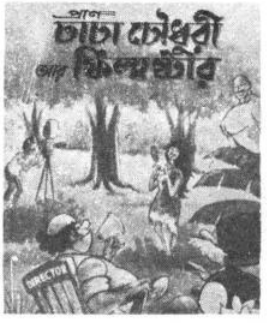

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী ওনার কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার প্রধান সাহায্যকারী। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দেবে।

মধ্যবিত্ত কেরাণীর সমস্যা-গুলোর সঙ্গে অনবরত লড়াই চালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আনন্দও দিয়ে আসছে কার্টুনিষ্ট প্রাণের অদ্ভূত চরিত্র রমন। পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত হাসিতে ভরপুর রমনের নতুন কমিকস্।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি পিংকী ওর দাদু আর ঝপটজীকে সঙ্গে নিয়ে অদ্ভূত-অদ্ভূত কান্ডকারখানা করে তোমাদের তো বটেই, অত্যন্ত গোমড়া-মুখোদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু ওর সঙ্গীসাথী গান্দু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ানকে নিয়ে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য বুকষ্টলে হাজির হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনোরঞ্জক। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু এবং অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত' ফ্যান্টমের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক্।

ডায়মন্ড কমিকস্-এর নবতম নিবেদন

ব্রহ্মান্ডের অধিপতি 'হী-ম্যান' এখন বাংলাতেও ডায়মন্ড মিনি কমিকসে প্রকাশিত হয়েছে!

সংখ্যা ঃ 1-12

প্রতি সংখ্যার মূল্য ঃ 3/-

বিশ্ববিখ্যাত কমিকস্ 'স্পাইডার-ম্যান' এখন বাংলাতেও! সংখ্যা 1-2 স্টলে হাজির হয়ে গেছে।

মূল্যঃ 8/-

স্টীকার ফ্রী

DIAMOND COMICS (P) LTD.

2715, Darya Ganj New Delhi-110 002.

DISTRIBUTORS **VISHAL BOOK CENTRE** 4 TOTTEE LANE CALCUTTA-16

বাঁটুল দি গ্রেট

ছিঃছিঃ! নোংরা হোমওয়ার্কের খাতার জন্যে টিচার অভিযোগ করে চিঠি দিয়েছে। বিচ্ছুদুটোর খাতায় সব আঙ্গুলের নোংরা ছাপ আর ব্লটিংয়ের চিহ্নে ভরতি!

এসব বন্ধ করতে হবে! তোদের টিচার তোদের হোমওয়ার্কের খাতায় সর্বত্র কালি লাগানোর ব্যাপারে আমার কাছে চিঠি দিয়েছে!

আমি আর কোনমতেই এসব বরদাস্ত করবো না! বুঝেছিস?
তোরা তোদের খাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবি!

তুমি চাপড় মেরে আমাদের কালির শিশি শূন্যে তুলে দিয়েছো!
মরেচে! এখন দ্যাখো তুমি কি করেছো!

পরদিন সকালে
বেশ, ঠিক আছে! আমি গিয়ে টিচারকে বুঝিয়ে বলবো যে এবারে এটা তোদের দোষ নয়!
স্কুল

লজ্জার ব্যাপার! টাকু, ছেলেদের কিছু হোমওয়ার্কের খাতা এনে বাঁটুলকে দেখাও যে, কেমন করে ওগুলি রাখতে হয়!
ঠিক আছে, স্যার! এই যে এনেছি!

তুমি দ্যাখো, এগুলি কতো পরিপাটি আর পরিষ্কার!
ঠিক আছে, কিন্তু কেউ যদি ডেস্কে এইভাবে চাপড় মারে—

—এই ভাবে—
ঢপাস!
ওহ্, দ্যাখ্! টিচারের বড় বোতলটা এবার শূন্যে উঠে যাচ্ছে!

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

কার্ত্তিক ১৪০০
অক্টোবর ১৯৯৩

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ □
স্বর্ণখনির অন্তরালে—নারায়ণ দেবনাথ

শ্রদ্ধাঞ্জলি □
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ
—স্বামী মুক্তিকামানন্দ ৫০

ধারাবাহিক □
অরণ্যপতি টারজান
(অ্যাডভেঞ্চার)—সব্যসাচী ৩০

বড় গল্প □
পুরস্কার—রঞ্জন প্রসাদ ২২

ভূতের গল্প □
পিণ্ডিদান—প্রবোধ নাথ ৬

রূপকথার গল্প □
ভালুকের লেজ নেই
—দেবযানী কর ২০

গল্প হলেও সত্যি □
রাখে কৃষ্ণ মারে কে
—সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ৯

হাসির গল্প □
গোয়েন্দা হলো জব্দ—রণেন বসু ৩৪

প্রাণীবিজ্ঞান □
পাখির মজা ঃ মজার পাখি
—সৌমেন্দু সামন্ত ১২

বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রতিযোগিতা □
গল্পের রাজা (ক বিভাগ)
—রীতেশ ঘোষ ৬৬
প্রকৃত সর্দার (খ বিভাগ)
—জয়দীপ গুহ ৬৮
পুণ্য প্রভাত (গ বিভাগ)
—তাপস চক্রবর্তী ৭০

বীর বাঙালী □
বাংলার শেষ দ্বারপাল
—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮

ফিচার □
পিটা—কাজল ভট্টাচার্য ৩৭
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ৬৩
ভবিষ্যতের ঠিকানা
—পদ্মা চৌধুরী ৪১
মজার খবর—বরুণ মজুমদার ৬৫

বিশ্ববিচিত্রা □
জিজ্ঞাসা ৭২
সত্যি ! ৬৪

কবিতা □
হীরালাল পালোয়ান—অরবিন্দ
ভট্টাচার্য ৫

বিভাগীয় লেখা □
খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩
পড়ার সঙ্গে খেলা—বীরু বসু ৬১
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ৬২
দাদুমণির চিঠি ১৫
তোমাদের পাতা ১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৪৪
সুবোধচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি
পুরস্কার ৩৩

পুরস্কৃত গল্প □
ডাকাতের হাতে (প্রথম)
—এলা নাগ ৪৭
কুড়ানির মা (দ্বিতীয়)
—সুলক্ষণা রায় ৪৭

ছবিতে গল্প □
যুগ যুগান্তের যাত্রী (রঙিন)
—ময়ূখ চৌধুরী ১৮
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৪২
ভয়ঙ্করের মোকাবিলায়
ম্যাম'জেল এক্স ২৮

ঘোষণা □
নির্মল সাহা স্মৃতি সাহিত্য
প্রতিযোগিতা ৪৯
জানো কী ৩৬

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকে ঃ বুক পোস্টে - ১১০টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।

Annual Subscription
Bangladesh— **Rs. 235.00**
U.K. and U.S.A.— **By Sea Mail Rs. 327.00**
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দাম ঃ ৮ টাকা মাত্র

অধিকাংশ মা-বাপই এই উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখেন।

বৈ শি ষ্ট্য স মূ হ

- এক খোলা অবধির-যোজনা।
- 15 বছর বয়স অবধি ছেলেমেয়েদের জন্য যোজনা। 18 থেকে 23 বছর বয়স মধ্যে সময়ানুসার কিস্তিতে টাকা তোলার সুবিধা।
- প্রতি ইউনিট 10 টাকা, কমপক্ষে বিনিয়োগ 2000 টাকা, এবং তারপরে 500 টাকার গুণিতকে।
- ফাণ্ডের বৃদ্ধি সময়ে সময়ে বোনাস ইউনিট-রূপে জমা করা হবে।
- প্রতি বছরে দুইবার আংশিক টাকা তোলা মঞ্জুর - 18 বছর বয়সে 50%, এবং প্রতি বছরে অতিরিক্ত 10% করে, 23 বছর বয়স অবধি।
- অন্য সন্তানেরও নামে নমিনেশনের সুবিধা।

CHILDREN'S COLLEGE AND CAREER FUND

UNIT PLAN-93

কারণ আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের দায়িত্ব আপনারই

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

আপনার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্যে।

কর্পোরেট কার্যালয়ঃ ১৩, স্যার ভিঠলদাস থ্যাকারসে মার্গ (নিউ মেরিন লাইন্স) বোম্বাই ৪০০ ০২০, ফোন-২০৬৮৪৬৮ **জোনাল কার্যালয়ঃ** ২ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন-২০ ৫৩২২ **শাখা কার্যালয়ঃ** আশানিবাস, ২৪৬ লুইস রোড, ভুবনেশ্বর ৭৫১ ০১৪, ফোন-৫৬১৪১ ● ২ ও ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন-২০ ৯৩৯১ ● ৩য় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ২য় তল, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩ ২১৬ ফোন-৮১০২ ● জীবনদীপ, এম এল নেহরু রোড, পান বাজার, গৌহাটি ৭৮১ ০০১, ফোন-৪৩১৩১, ● ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বিল্ডিং, মেইন রোড, বিস্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১ ০০১ ফোন-২৫৫০৮ ● জীবনদীপ, একজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১, ফোন-২২২৪৭০ ● জীবনদীপ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ৪০১

সব সিকিউরিটী বিনিয়োগেই ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং, বিনিয়োগের পূর্বে আপনার বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা বা এজেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন।

যো জ না খো লা আ ছে।

UTI-144-93-BEN

শুকতারা

৪৩শ বর্ষ ● ৯ম সংখ্যা ● কার্ত্তিক ১৪০০/অক্টোবর ১৯৯৩

হীরালাল পালোয়ান

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

হীরালাল পালোয়ান আলোয়ান জড়িয়ে
এসে কয়—জেনো আমি ওস্তাদ লড়িয়ে!
ম্যাডাগাস্কারে গত এপ্রিলে গামাকে
হারাবার তরে ওরা বলেছিল আমাকে।
দু'মিনিট—খ্যাতনামা গামা গেল ছিটকে!
লন্ডনে হারিয়েছি ব্ল্যাক হারমিটকে।
ভুলো শুনে হেসে বলে—বাহা বাহা, বেশ তো,
বাংলার মাঠে লড়া আছে অভোস তো?
হীরালাল চটে যায়—তুমি কে হে, ছোকরা?
এ দেশেতে কুস্তি তো লড়ে ছারপোকরা।
যে লড়বে চলে এসো, আমি পিষে মারবো,
বাংলার মাঠে তাকে জীবন্ত গাড়বো।
এসো তবে, দেখা যাক—ভুলো হাসে মুচকে।
অন্যেরা হেসে কাত, বলে—আরে পুঁচকে!
তোমাকে তো জল দিয়ে এক ঢোঁকে গিলবে।
ভুলো বলে—অন্ততঃ খাদ্য তো মিলবে।
হীরালাল পালোয়ান আলোয়ান খুলল,
প্রশস্ত বক্ষটা ছ' ইঞ্চি ফুলল।
ভুলো তাকে এক হাতে মাটি থেকে উঁচিয়ে
ছুঁড়ে দিল—বাংলার বদনাম ঘুচিয়ে,
হাত ঝেড়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে সে দেখল
পালোয়ান দেহখানা গাছে গিয়ে ঠেকল।
—নেমে এসো হীরালাল, গেলে কেন ফুরিয়ে?
হীরালাল কেঁদে কয়, হাড় গেছে গুঁড়িয়ে!

ছবিঃ অমল

পিণ্ডিদান

প্রবোধ নাথ

অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর পথটাই বেছে নিল পরান সাহা। বাপের দেওয়া কিছু টাকা ছিল। ছোটবেলার বন্ধু বিশু মল্লিক ব্যবসা করবে বলে স্ট্যাম্প পেপারে সই দিয়ে টাকাটা নিল মোটা সুদের লোভ দেখিয়ে। সুদও দিল ক'মাস। তারপর রাতারাতি ব্যবসা গুটিয়ে সেই যে গা-ঢাকা দিল বিশু মল্লিক, সাত তল্লাট গরু খোঁজা খুঁজেও তার পাত্তা পেল না পরান সাহা। টাকার শোকে আর অভাবের জ্বালায় ঠিক করলো পরান, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে বরং সুইসাইড করা ভাল। ছেলেকে ডেকে বললো, বাবা ঘনশ্যাম, বিশু মল্লিক আমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা ধার নিয়ে যে কাগজখানায় সই করেছে ওখানা আছে আলমারিতে। পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সইও আছে। যত্ন করে রাখিস কাগজখানা। বেঁচে থাকতে তো আমি ওর দেখা পেলাম না, তবে বিশু মল্লিক বেঁচে থাকলে ওর সঙ্গে তোর দেখা করাবোই। সেদিন কাগজখানা দেখিয়ে টাকাটা কিন্তু আদায় করিস।

ঘনশ্যাম বাপের কথাটা ঠিক বোঝে না, তবু ঘাড় কাত করে।

আর একটা কথা, পরান বলে, আমি যদি হঠাৎ মারাও যাই, মরতেই পারি, মানুষের জীবন তো, তবে যেন তড়িঘড়ি গয়ায় পিণ্ডি চড়িয়ে বসবি না। পাক্কা দুটি বছর অপেক্ষা করবি বিশু মল্লিকের জন্য। দেখা না পেলে তখন যা ভাল বুঝিস করবি। কেমন!

আর সে রাতেই ভাগীরথী এক্সপ্রেসে গলা দিল পরান সাহা।

অপঘাতে মৃত্যু। মরলেই ভূত। প্রথমটাই যা একটু কষ্ট, তারপরই শরীরটা একদম পাখির পালকের মতো হালকা। ভূত হয়ে রেল লাইনের ধারে এক দীঘল শেওড়া গাছে একনাগাড়ে সাত রাত সাত দিন ঘুমিয়ে কাটালো পরান। বেঁচে থাকতে ভাবনায় চিন্তায় কত রাত ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। ঘুমিয়ে এখন শরীরখানা শান্ত হলো, সুস্থির হলো। মনে পড়লো বিশু মল্লিকের কথা। ও শয়তানটার জন্যেই আজ তার এ ভূতের দশা। ঠিক করলো প্রথমে গ্রামেগঞ্জে ওকে খুঁজে দেখবে। এখন তো আর হাঁটা চলার বালাই নেই। শুধু মনে মনে ভাবলেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং বেঁচে থাকলে বিশু মল্লিককে খুঁজে বার করতে সময় লাগবে না।

তার আগে একবার ছেলে ঘনশ্যাম ও বৌকে দেখার বাসনা হলো পরান সাহার। কেমন আছে ছেলেটা বাপকে হারিয়ে।

শেওড়া গাছ ছেড়ে হাওয়ায় ভেসে গ্রামের দিকে এগিয়ে চললো পরান সাহা। গ্রামে ঢুকতেই দেখলো চণ্ডীতলার মাঠে অনেক লোকের ভিড়। ছেলে ঘনশ্যাম একটা চেয়ারে বসে আছে তার বাপের ছবির সামনে চুপটি করে। এটা তবে তার শোকসভা হচ্ছে। পরান সাহা ভাবল, বাঃ! খুব ভাল তো। একটু না হয় বসে দেখাই যাক কি দিয়ে কি করে গেরামের মানুষ। মাঠের

ধারে একটা গাব গাছে পা ঝুলিয়ে বসলো পরান।

সভায় লোকজন মন্দ হয়নি। মাইক লাগিয়ে কার্তিক সভা ম্যানেজ করছে। বলছে, পরান সাহার এ শোকসভার আয়োজন করেছেন আমাদের গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজদরদী হরগোবিন্দবাবু। তিনি এখুনি এসে পড়বেন। আপনারা দূরে না দাঁড়িয়ে থেকে সভায় এসে বসুন।

হরগোবিন্দবাবুকে চিনতো পরান। বিশু মল্লিকের শালা। বিশু মল্লিক ফেরার হওয়ার পর বোনের সংসার বাঁচাতে হরগোবিন্দবাবু সেই যে সে সংসারে গিয়ে উঠলো আর ফিরে যায়নি নিজের বাড়িতে। এখানে থেকেই ভগ্নীপতির ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিশাল করে তুলেছে। চেহারায় সাধক সাধক ভাব। কাঁচা পাকা এক জঙ্গল দাড়ি গোঁফে মুখখানা ঢাকা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মুখে রাধাকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনো বুলি নেই। বেঁচে থাকতে হরগোবিন্দবাবুর সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে পরান সাহার। মানুষটাকে মোটেই ভাল লাগতো না তার। সব সময় চোখে মুখে যেন কি খাই কি খাই ভাব।

কার্তিক আবার ঘোষণা করলো, এবার সভার কাজ শুরু হচ্ছে। সভাপতির আসনে এসে বসবেন মহামান্য শ্রীহরগোবিন্দ বিশ্বাস।

হরগোবিন্দবাবু সভাপতির চেয়ারে এসে বসলো। তাকে দেখে পরান সাহা এমন চমকে উঠলো যে গাছের ডাল থেকে হড়কে নিচে পড়ে যাওয়ার যোগাড়! ব্যাটা, তুমিই তবে হরগোবিন্দবাবু! শয়তান, চোর, জোচ্চোর! হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে লাগলো পরান সাহা।

হয়েছে কি, মরে ভূত হওয়ার পর পরান সাহা একটা অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছে। এটা অবশ্য সব ভূতেরাই পায়। সে দৃষ্টি দিয়ে ভূতেরা অনেক অজানা জিনিস, অদেখা বস্তু জানতে পারে, দেখতে পায়।

ওই যে ঘড়িটা হাতে দিয়ে সভা ম্যানেজ করছে কার্তিক ওটা পরানেরই ঘড়ি। লাইনে গলা দেওয়ার পরদিন সকালবেলা কার্তিকই ওকে প্রথমে দেখতে পায়। দেখে ওর হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিজের হাতে পরে তবেই গ্রামে গিয়ে খবর দেয়।

কার্তিকের পরে ও পথে আসে নৃপতি। পরানকে মরে পড়ে থাকতে দেখে দুঃখ করে। এদিক সেদিক তাকিয়ে পরানের পকেট থেকে দুটাকা পঞ্চান্ন পয়সা তুলে নিজের পকেটে ভরে গ্রামে ফিরে ঘনশ্যামকে খবরটা দিয়ে কর্তব্য সারে।

সে যা গেছে যাক। তার জন্য পরান মোটেই ভাবিত নয়। কিন্তু ওই হরগোবিন্দ! এক মুখ গোঁফ দাড়ির জঙ্গলের আড়ালে নিজের আসল মুখখানা ঢেকে চেহারাখানা পাল্টে বিশু মল্লিকই কিনা আজ দু'বছর ধরে হরগোবিন্দ সেজে দিব্যি নিজের সংসারে সুখে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকতে ঘুণাক্ষরেও কি জানতে পেরেছিল এটা পরান সাহা! সে তখন কতদিন গেছে বিশু মল্লিকের দোকানে জিনিস কিনতে। মাঝে মাঝে শুনিয়েছে তার ভগ্নীপতির টাকা মারার কাহিনী। শুনে মাথা নেড়ে তাকে শুধু কেষ্ট নাম শুনিয়েছে হরগোবিন্দ।

যাক, আত্মহত্যাটা তবে সার্থক হয়েছে পরান সাহার। ভূত হয়েছে বলেই চিনতে পারল বিশু মল্লিককে। এখন গ্রামের পাঁচজনের কাছে ব্যাটার পরিচয়টা ফাঁস করাতে পারলেই নিশ্চিন্তি।

ছেলে বৌয়ের সঙ্গে দেখা করার বাসনা ত্যাগ করে পরান নদীর ধারে শ্মশানঘাটের পঞ্চবটের মগডালে গিয়ে বসলো। ওখানে দেখা হলো ছোটবেলার বন্ধু ফেলুরামের সঙ্গে। বছর দশেক আগে শান্তিপুর-কালনা ফেরি ঘাটে নৌকাডুবিতে মারা গিয়েছিল ফেলা। পরানের মুখে সব শুনে ফেলা লাফিয়ে উঠলো, বললো, চল, এখনি ব্যাটার ঘাড় মটকে আসি।

দূর, তাহলে আমার টাকাটা আদায় হবে? প্রথমে ওর গোঁফ দাড়ি কামিয়ে গ্রামের পাঁচজনের কাছে পরিচয়টা ফাঁস করতে হবে যাতে ঘনশ্যাম টাকাটা আদায় করতে পারে।

বুঝলাম, কিন্তু আমাদের যে লোহা ছোঁওয়া বারণ। নইলে খুরের একটানে হরগোবিন্দের মুখের জঙ্গল সাফা করতে কতক্ষণ।

না ওভাবে হবে না। এমন রাস্তা বার করতে হবে যেন ব্যাটা নিজেই নিজের দাড়ি গোঁফ কাটতে বাধ্য হয়।

কি করা যায় ভাবতে ভাবতে দু'জনে আবার চণ্ডীতলার মাঠে এসে গাব গাছের ডালে বসে। সভা ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। হরগোবিন্দ ঘনশ্যামকে কাছে ডেকে কি যেন বলছে। কি বলছে শোনার বাসনা মনে পোষণ করতেই পরান সাহা গাছের ডালে বসেই শুনতে পায় হরগোবিন্দ বলছে, খরচ খরচা হবে বলে পিণ্ডি দেবে না? তোমার বাবা যে তবে নরকে পড়ে পচবে হে! যাও মাকে নিয়ে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ঘুরেও এসো আর পিণ্ডিটাও দিয়ে এসো। টাকার জন্যে ভাবছো কেন, আমি তো আছি। দেখ আমার ভগ্নীপতির সই করা একটা কাগজ আছে তোমার বাবার আলমারিতে। ওখানা আমায় এনে দিলেই আমি তোমাকে হাজার টাকা অমনি দিয়ে দেব।

কিন্তু বাবা যে কাগজখানা খুব যত্ন করে রাখতে বলেছে দু'বছর, ঘনশ্যাম বলে।

কি লাভ! হরগোবিন্দ অল্প হাসে, বিশু মল্লিক কি আর কোনোদিন ফিরবে ভেবেছো? আর সে না ফিরলে ও কাগজখানার মূল্যই বা কি! তার চেয়ে তুমি বরং কাগজখানা নিয়ে কাল বা পরশু আমার বাড়িতে এসো, আমি নয় তোমাকে দেড় হাজার টাকাই দেব।

বেশ, ভেবে দেখি। মাকেও জিজ্ঞেস করি মা কি বলে।

ভাবো, তবে বেশি দেরি করো না। যা করার কাল পরশুর মধ্যেই করো। আমি আবার কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাব কিনা!

শুনে পরান আর ফেলুরাম ঠিক করলে যা করার দু'একদিনের মধ্যেই করতে হবে। কারণ লোভে পড়ে ঘনশ্যাম যদি কাগজখানা একবার হাতছাড়া করে আর টাকা পেয়ে গয়ায় গিয়ে যদি পিণ্ডি চড়ায় তবে বিশু মল্লিকের পিণ্ডি চটকানোর আগেই নিজের দফা গয়া।

এ অবস্থায় কি করা যায় বল তো ফেলুরাম? পরান বন্ধুর পরামর্শ চায়।

ও আমি ভেবে রেখেছি। হরগোবিন্দের দাড়িতে উকুন ছাড়তে হবে যাতে ব্যাটা উকুনের কুটকুটুনিতে ছটফটিয়ে দাড়ি কাটতে বাধ্য হয়।

বুঝলাম। কিন্তু আমরা উকুন পাবো কোথায়? ভূত হয়ে তো আমাদের সকলেরই নেড়া মুণ্ডি।

সেও আমি ভেবে রেখেছি। আমার নাতনী পুঁটির মাথা ভরা উকুন। ওখান থেকে চাট্টি এনে হরগোবিন্দের দাড়িতে ছাড়লেই হবে।

দূর! পরান সাহা মাথা ঝাঁকায়, ও সব পাতি উকুনে হরগোবিন্দের কিচ্ছু হবে না। সরু চিরুনি চালিয়ে কিংবা উকুন মারার ওষুধ লাগিয়ে উকুন তাড়াবে। আসল চীনে উকুন চাই।

ওখানে বসেই অন্তর্দৃষ্টি চালিয়ে তাও বার করলো ফেলুরাম। মানকুণ্ডুর পাগলা গারদের এক পাগল, উকুনের জ্বালাতেই বেচারা পাগল হয়েছে, ওর মাথা ভর্তি চীনে উকুন। ডাক্তাররা রাতদিন ওকে ঘুমের ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। জেগে থাকলেই শুধু চুল ছেঁড়াছিঁড়ি আর চিৎকার। ওর মাথা থেকে চাট্টি উকুন এনে ঘুমন্ত হরগোবিন্দের দাড়িতে ছেড়ে দিল ফেলুরাম। দিয়ে দু'জনে গাব গাছের ডালে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

উকুনের কুটকুটুনিতে ঘুম ভেঙে গেল হরগোবিন্দবাবুর। এ কি আপদ রে বাবা! এত যত্ন করার পরও কিনা দাড়িতে উকুন! বিছানায় বসে আয়না সামনে ধরে দাড়িতে সরু চিরুনি চালালো কতক্ষণ, তারপর আবার ঘুমুতে গেল। কিন্তু উকুনের কামড়ানিতে দু'চোখের পাতা এক মুহূর্তের জন্যেও সারা রাত এক করতে পারলো না।

ভোরের আলো ফুটতেই ডেটল, উকুন মারার ওষুধ আর কার্বোলিক সাবান নিয়ে হরগোবিন্দ বাথরুমে ঢোকে। ওষুধ মেখে, দাড়িতে সাবান ঘষে তিন ঘণ্টা স্নান সেরে বাথরুম থেকে যখন হরগোবিন্দ বের হলো ছোবড়ার ঘষটানিতে মুখখানা টকটকে লাল। ভাবলো বুঝি নিশ্চিন্ত। কিন্তু চীনে উকুন এত সহজে কাবু হওয়ার পাত্র নয়! আর হরগোবিন্দের মতো এমন নধরকান্তি মানুষের সুস্বাদু রক্ত, উকুনদের যেন ভোজবাড়ির নেমন্তন্ন। তবে কিনা দিনের আলো ফুটলে ওরা হাত পা খেলিয়ে একটু বিশ্রাম করে। তাই হরগোবিন্দের দিনটা কাটলো ভালয় ভালয়। কিন্তু সন্ধ্যের পরেই চুলকুনি বাড়লো। ঘুমুলে পরে দাড়ির জঙ্গলে শুরু হলো বাঘ-ভাল্লুকের লড়াই। লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নামলো হরগোবিন্দ। এক পাক চর্কি নাচন নাচলো। তারপর খুঁজে এক শিশি 'টিক টোয়েন্টি' বার করে ঢাললো দাড়ি ভরে। ব্যস, চুলকানি একেবারে বন্ধ।

চীনে উকুন কিন্তু ভারী চালাক। টিক টোয়েন্টির উগ্র গন্ধ পেয়ে একদম দাড়ির গোড়ায় গিয়ে লুকোলো সবকটা। কোনোটা আবার গোড়ার গর্তে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। ওষুধের তেজ সরতেই শুরু হলো দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে তাণ্ডব নৃত্য। গেছিরে গেছিরে চিৎকারে হরগোবিন্দ নাচতে লাগলো উইচিংড়ের মতো।

ভোরের আলো ফুটলেই হরগোবিন্দ দাড়িকাটার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকলো বাথরুমে। গ্রাম ছেড়ে লোপাট হওয়ার পর প্রায় আজ আড়াই বছর দাড়ি গোঁফ কাটেনি হরগোবিন্দ। এখন কেটে শান্তি।

দাড়ি গোঁফ কামিয়ে গন্ধ সাবান মেখে স্নান করতে করতে যেন আপনা থেকেই দু'চোখ বুজে আসতে লাগলো। এমন সময় স্নানঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চাকর খবর দিল, বাবু, ঘনশ্যামবাবু এয়েচেন একখানা কাগজ হাতে করে। আপনি নাকি কাগজখানা কিনবেন বলেছিলেন।

শুনেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে হরগোবিন্দ। স্নান সেরে কোনো রকমে গায়ে জামা-কাপড় চড়িয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে বলে, এনেছো? বেশ বেশ, দাও কাগজখানা। বাপের পিণ্ডি দিতে যাবে বলে কথা, ও তোমাকে আমি আরও পাঁচশো টাকা বেশিই দেব।

হরগোবিন্দের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ঘনশ্যাম। অবাক হয়ে বলে, আপনি! আপনিই তবে বিশু মল্লিক! দাড়ি গোঁফে মুখ ঢেকে হরগোবিন্দ সেজে দিব্যি এতকাল চালিয়ে দিলেন! আর আমার বাবা বেচারা অকালে প্রাণ দিয়ে মরলো!

হরগোবিন্দ ওরফে বিশু মল্লিক থমকে যায়।

ঘনশ্যাম উঠে দাঁড়ায়। কাগজখানা বুকে চেপে ধরে বলে, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আসছি পাড়ার পাঁচজনকে নিয়ে। বাবার পিণ্ডিদান করতে আপনি আমায় গয়ায় পাঠাচ্ছিলেন, এখন ফিরে এসে আপনার পিণ্ডি চটকাবো। দুমদাম পায়ের আওয়াজ করে ঘনশ্যাম বেরিয়ে যায়।

গালে হাত বোলাতে বোলাতে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বিশু মল্লিক। বসে সামনের দেওয়াল আয়নার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

ছবি : ধ্রুব রায়

রাখে কৃষ্ণ মারে কে

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

বেলা ন'টা। নভেম্বর মাসের শেষ। বাতাসে শীতের আমেজ। চমৎকার একটা মোটর চলার রাস্তা সোজা চলে গেছে পশ্চিম থেকে পুবে জঙ্গলের বুক চিরে। দুপাশে ঘন গাছপালা। তার মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নাম-না-জানা অসংখ্য পাখির ডাক। বাতাসে আরও মিশে আছে নানা বুনো ফুলের গন্ধ। আকাশ থেকে ঝরে পড়া সকালের মিষ্টি রোদে চারদিক ঝলমল করছে।

রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে পুব দিকে এগিয়ে চলেছে একখানা টকটকে লাল রঙের সদ্য কেনা মারুতি গাড়ি। গাড়িতে যাত্রী বলতে গাড়ির মালিক ধনী ব্যবসায়ী প্রীতম সিং, তাঁর স্ত্রী আর ছোট দুটি ছেলে মেয়ে। গাড়ি চালাচ্ছে নেপালী ড্রাইভার বাহাদুর। ওঁদের গন্তব্যস্থল জলপাইগুড়ি শহর।

জলপাইগুড়ি পৌঁছতে বড়জোর আর এক ঘণ্টা। সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে মোটর জার্নি সকলেই বেশ উপভোগ করছিলেন। বাহাদুর পাকা ড্রাইভার হওয়ায় গাড়ির গতিবেগ উঠে গেছে ঘণ্টায় প্রায় একশ কিলোমিটারের কাছে। পিচঢালা চমৎকার মসৃণ পথ, বাধা বলতে কিছু নেই।

'শহরে এমন চমৎকার গাড়ি চালানোর সুযোগ পাওয়া যায় না', প্রীতম সিং বলে উঠলেন। 'ঠিক হ্যায় না বাহাদুর?' বাহাদুরের দিকে তাকালেন প্রীতম সিং।

'জী', হেসে জবাব দিল বাহাদুর সোজা তাকিয়ে।

'সামনে একটা বাঙলো রয়েছে না?' মিসেস সিং হঠাৎ বলে উঠলেন।

প্রীতম সিং তাকাতেই বাঙলোটা দেখতে পেলেন।

'হ্যাঁ, একটা বাঙলোই বটে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেরই হবে হয়তো।'

'একটু জিরিয়ে নিলে হয় না ওখানে?' মিসেস সিং বললেন।

'না, একেবারে সোজা জলপাইগুড়ি পৌঁছেই বিশ্রাম করা যাবে। থামলেই অযথা দেরি হবে।'

বাঙলোর সামনে আসতেই কিন্তু গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো বাহাদুর। রাস্তায় একটা বেড়া দিয়ে সাময়িকভাবে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

একটু বিরক্ত হয়েই গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়লেন প্রীতম সিং। সঙ্গে সঙ্গে খাকি পোশাক পরিহিত একজন ফরেস্ট গার্ড এগিয়ে এল বাঙলোর মধ্য থেকে।

'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?' লোকটা প্রশ্ন করল।

'জলপাইগুড়ি', জবাব দিলেন প্রীতম সিং। 'রাস্তা বন্ধ কেন?'

'আপনারা কোনো খবর রাখেন না?'

'খবর? কিসের খবর?' একটু অবাক হলেন প্রীতম সিং।

'একটা গুণ্ডা হাতি এলাকা জুড়ে অত্যাচার চালাচ্ছে', পাশ

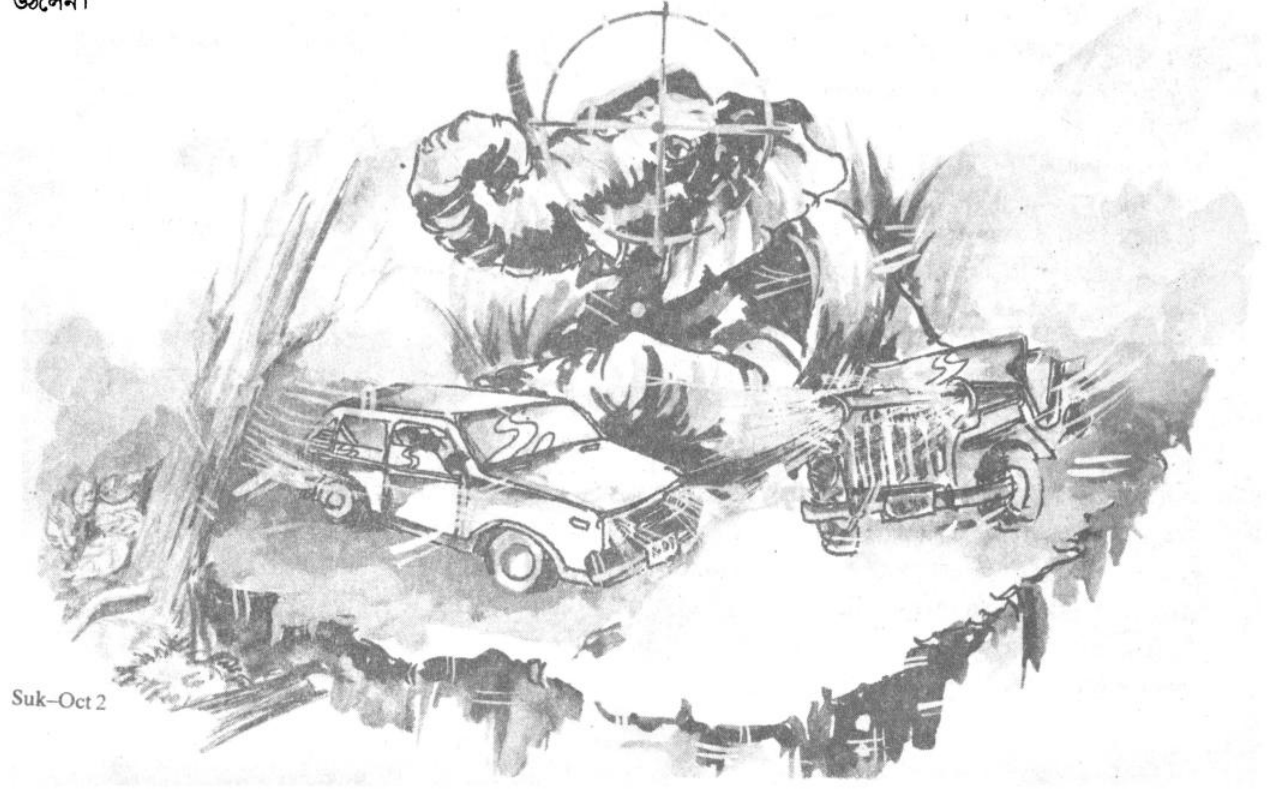

থেকে কে যেন বলে উঠলেন। 'এই পথে তাই চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আপনাদের ফিরে যেতে হবে।'

প্রীতম সিং ঘুরে দাঁড়াতেই বক্তা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফিটফাট পোশাক পরা একজন ভদ্রলোক।

'আপনি?' প্রীতম সিং জানতে চাইলেন।

'আমি এখানকার রেঞ্জার কমল সেন। সরকারের নোটিশ জারি হয়েছে এই রাস্তায় দিনে বা রাত্রিরে কোনো সময়ই যেন গাড়ি চলতে দেওয়া না হয়। নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা। অথচ এ খবর আপনারা জানেন না, আশ্চর্য ব্যাপার!'

'হাতিটা কি এই এলাকাতেই আছে?'

'সে খবর আমাদের জানা নেই। তবে শুনেছি এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তার আবির্ভাব ঘটেছে। এ পর্যন্ত তিনজন মানুষকে সে মেরেছে। গুণ্ডা হাতিটাকে মারার জন্য কলকাতা থেকে একজন নামকরা শিকারীকে ডেকে পাঠানোও হয়েছে। হাতিটাকে না মারা পর্যন্ত এ পথে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক।'

'কিন্তু আমাদের যে জলপাইগুড়ি পৌঁছতেই হবে', প্রীতম সিং বলে উঠলেন। 'আর তো বেশি দূর নয় শহরটা। দিনের বেলায় কোনো ভয়ের কারণ নেই। আপনি রাস্তা খুলে দিন, এক ঘণ্টাতেই আমরা পৌঁছে যাব।'

'না, তা হয় না', রেঞ্জার মাথা নাড়লেন। 'দায়িত্ব আমার উপরেই পড়বে আপনাদের কিছু ঘটলে।'

'দেখুন রেঞ্জার সাহেব, আজ সময়মতো না পৌঁছতে পারলে বড্ড ক্ষতি হয়ে যাবে আমার। আমি বন্ড সই করে দিচ্ছি, আপনার কোনো রকম দায়িত্ব থাকবে না', বললেন প্রীতম সিং।

'অসম্ভব', রেঞ্জার মিঃ সেন তবু রাজী হলেন না। 'হাতিটা সাংঘাতিক ধূর্ত। সে বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস করে তিনজনকে পায়ে পিষে মেরেছে। এ অবস্থায় এত বড় ঝুঁকি কখনই আমি নিতে পারি না।'

প্রীতম সিংও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বলেন, 'আপনি তো বললেন হাতিটাকে এ এলাকায় দেখা যায়নি। দিনের বেলা সে নিশ্চয়ই এখানে আসবে না।'

রেঞ্জার মিঃ সেনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তর্কাতর্কি চলল প্রীতম সিংয়ের। শেষ পর্যন্ত প্রীতম সিংয়ের পীড়াপীড়িতেই মিঃ সেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁদের যেতে দিতে রাজী হলেন। যাওয়ার আগে বারবার তিনি সকলকে হাতিটার মতিগতি সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন। হাতিটাকে যাতে তাঁরা চিনতে পারেন সেজন্য জানিয়ে দিলেন যে তার একটা দাঁত মাঝখানে ভাঙা।

এরপর রাস্তার বাধা সরিয়ে দেওয়া হলো। প্রীতম সিং রেঞ্জার সাহেবকে ধন্যবাদ জানালে বাহাদুর গাড়ি ছেড়ে দিল।

বেলা প্রায় সওয়া দশটা বেজে গেছে ততক্ষণে। রোদ্দুরের তাপও সামান্য বেড়ে উঠেছে। ক্রমে জঙ্গল হালকা হয়ে আসতে লাগল। মাঝে মাঝে পড়ছে বেশ কিছুটা করে ফাঁকা জায়গা। প্রীতম সিংয়ের দুই ছেলেমেয়ে নানা রঙের পাখি দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠছে। বাহাদুরও তাড়াতাড়ি পৌঁছবার আশায় জোরে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছে।

খানিকটা পথ এইভাবে এসে এক জায়গায় তাঁরা দেখলেন পিচঢালা রাস্তাকে আড়াআড়ি রেখে আর একটা পথ দক্ষিণমুখো চলে গেছে। বাহাদুর সোজাই এগিয়ে যেত কিন্তু হঠাৎ সে গাড়ির গতি কমিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'সাব।'

'কি হলো, বাহাদুর?' প্রীতম সিং ঝুঁকে পড়লেন।

'আগে দেখিয়ে, সাব,' আতঙ্ক মেশানো গলায় বলেই ব্রেক কষল বাহাদুর। নতুন মারুতি সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল।

প্রীতম সিং আর তাঁর স্ত্রী সামনে তাকিয়েই ভয়ে হিম হয়ে গেলেন। প্রায় হাত পঞ্চাশ দূরে একটা বিশাল চেহারার হাতি সোজা ওঁদেরই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। তার একটা দাঁত মাঝখানে ভাঙা।

এটাই যে সেই গুণ্ডা হাতি, তাতে কারও আর সন্দেহ রইল না। সে যে মারুতি গাড়িটা লক্ষ্য করছে তাও বুঝে নিতে দেরি হলো না গাড়ির যাত্রীদের। একটু পরেই হয়তো মূর্তিমান বিভীষিকার মতোই ও ছুটে আসবে।

গাড়িটা ঘুরিয়ে নেওয়াও ওই মুহূর্তে অসম্ভব ছিল। মিসেস সিং তাঁর দুই সন্তানকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কাঁদতে শুরু করেছেন ততক্ষণে।

হাতিটা শুঁড় তুলে বুক হিম-করা একটা চিৎকার করে ছুটে আসতে লাগল গাড়ির দিকে। বিশালকায় দাঁতাল হাতিটা। কুতকুতে দুই চোখে রাজ্যের জিঘাংসা ভরা। সকালের রোদ্দুর কালো শরীরে যেন পিছলে যাচ্ছে।

হাতিকে ছুটতে দেখে প্রীতম সিং অসহায়ের মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। ঠিক ওই মোক্ষম মুহূর্তে বাহাদুরও একটা চাপা আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল স্টিয়ারিংয়ের ওপর। তার শরীরের চাপে মারুতি গাড়ির জোরালো হর্ন প্যাঁ-প্যাঁ করে বেজে উঠল।

একটানা প্রচণ্ড সেই হর্নের আওয়াজে মাঝপথেই থমকে দাঁড়াল মূর্তিমান বিভীষিকা। এর পর চলচ্চিত্রের ঘটনাস্রোতের মতোই একের পর এক দৃশ্য অভিনীত হতে লাগল।

হয়তো এক মিনিটও কাটেনি, দক্ষিণমুখো রাস্তা দিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটে এল একটা জিপ গাড়ি। গাড়িটায় দুজন আরোহী। গুণ্ডা হাতিটার প্রায় দশ হাতের মধ্যে এসে ব্রেক কষে থেমে পড়ল জিপটা। দুদিকে শত্রু দেখে হাতিটার সম্বিতও যেন ফিরে এল।

গাড়ি থামতেই লাফিয়ে নামলেন দুই আরোহী। তাঁদের মধ্যে একজনের হাতে বিরাট একটা রাইফেল। মুহূর্তের মধ্যে সেটা

তুলে নিয়ে নিশানা ঠিক করে তিনি ট্রিগার টানলেন।

নির্ভুল নিশানা। গুলি সোজা গিয়ে বিঁধল হাতিটার কপালের ঠিক মাঝখানে। নড়ার সময়ও পেল না সে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কাত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

রাইফেল হাতে শিকারী ভদ্রলোক এবার মারুতি গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন।

প্রীতম সিং সব দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এই দুজন শিকারী কি তবে ঈশ্বর-প্রেরিত? যা ঘটে গেল তা কি সত্যি? তাঁর ঘোর কাটল একজনের কথায়।

'আমার নাম সন্দীপ চৌধুরী, আর এ আমার বন্ধু রমেন দত্ত। কিন্তু আপনারা এই ভয়ঙ্কর পথে চলেছিলেন কেন? হাতিটার কথা শোনেননি?' বলতে বলতে সন্দীপ চৌধুরী আর তাঁর বন্ধু বাহাদুরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিলেন।

নেমে এলেন প্রীতম সিংও। তিনি এসে জড়িয়ে ধরলেন সন্দীপ চৌধুরীকে। 'আমার নাম প্রীতম সিং। ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছিলাম জলপাইগুড়িতে। হাতিটার কথা আগে জানতাম না, তবে রেঞ্জার সাহেব বারণ করলেও শুনিনি, তাই—। আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন।'

'অত্যন্ত অন্যায় করেছিলেন। আমরা আর একমুহূর্ত দেরিতে এলে কি ঘটত ভাবতেও ভয় লাগছে! কলকাতা থেকে সোজা এদিকে চলে এসেছি সরকারের আমন্ত্রণ পেয়ে। আমরা খবর পেয়েছিলাম হাতিটাকে এদিকেই আসতে দেখা গিয়েছিল', উত্তর দিলেন সন্দীপ চৌধুরী।

'আপনাদের ঋণ কি ভাবে শোধ করব জানি না', কৃতজ্ঞ প্রীতম সিং বললেন।

'আপাতত মিসেস সিংয়ের ফ্লাস্কে যদি গরম চা থাকে তাই দিয়েই ঋণ শোধ করুন', হেসে বললেন সন্দীপ চৌধুরী। 'তবে আসল ধন্যবাদ প্রাপ্য আপনার ড্রাইভারের। সে জ্ঞান হারিয়ে স্টিয়ারিংয়ের উপর না পড়লে হাতিটাকে থামানো যেত না আর আমিও শিকারের সুযোগ পেতাম না।'

ছবিঃ রজতবরণ চক্রবর্তী

আপনি কি হারাচ্ছেন জানেন কি?

গ্রাহকদের জন্যে
বিশেষ সুযোগ

এক বছরের
পুজো সংখ্যা সহ ১২টি সংখ্যা হাতে নিলে ১২২ টাকার বদলে মাত্র ৯০ টাকা। বুক পোস্টে ১১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ১৭০ টাকা।

দু বছরের
দুটি পুজো সংখ্যা সহ ২৪টি সংখ্যা হাতে নিলে ২৪৪ টাকার বদলে মাত্র ১৭০ টাকা। বুক পোস্টে ২১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৩৩০ টাকা।

তিন বছরের
তিনটি পুজো সংখ্যা সহ ৩৬টি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৬৬ টাকার বদলে মাত্র ২৫০ টাকা। বুক পোস্টে ৩১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৪৯০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্যে এই বিশেষ সুযোগ নিতে হলে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে নিচের ঠিকানায় এম. করুন। চেক ও টেও টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক হলে ২০ টাকা বেশি লাগবে। 'শুকতারার জন্য' কথাটি পরিষ্কার করে লিখে দেবেন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

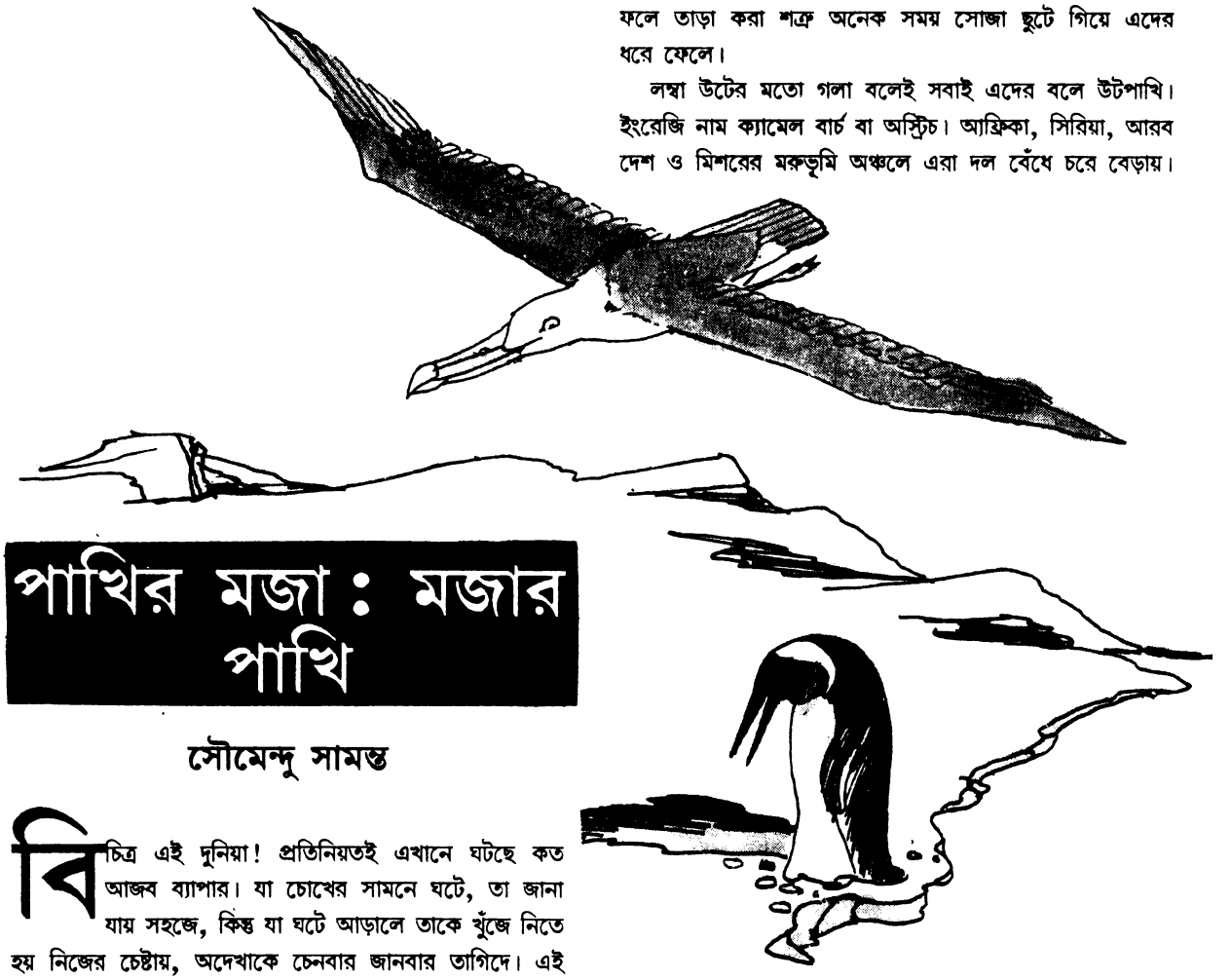

পাখির মজা : মজার পাখি

সৌমেন্দু সামন্ত

বিচিত্র এই দুনিয়া! প্রতিনিয়তই এখানে ঘটছে কত আজব ব্যাপার। যা চোখের সামনে ঘটে, তা জানা যায় সহজে, কিন্তু যা ঘটে আড়ালে তাকে খুঁজে নিতে হয় নিজের চেষ্টায়, অদেখাকে চেনবার জানবার তাগিদে। এই তাগিদেই মানুষ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে প্রকৃতির প্রজাদের খুঁটিনাটি আচরণ। এখানে সেই সব প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের দেখা কিছু পাখির কথা বলব। সেই সব পাখিদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথা শুনলে তাজ্জব বনে যাবে সবাই।

প্রথমেই যাদের কথা বলছি, তাদের সবাই পাখি বললেও তারা কিন্তু আকাশে উড়তে পারে না। দুটো ডানা নৌকোর পালের মতো ছড়িয়ে দিয়ে তারা এত জোরে ছুটতে পারে যে অন্য আর কোনো প্রাণী এদের সঙ্গে পেরে ওঠে না! দৌড়ের পাল্লায় ঘোড়ারাও এদের কাছে হার মানে। বহুদূর পর্যন্ত এরা একনাগাড়ে দৌড়াতে পারে। ভারী শরীরের জন্য যেহেতু এরা উড়তে পারে না, সে কারণেই শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য এদের পায়ের ক্ষমতার ওপরই ভরসা করতে হয়। দৌড়েই পালিয়ে এরা শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে। আবার মারাও পড়ে এই দৌড়ের জন্য। এরা সাধারণত সোজা দৌড়ায় না, এঁকে বেঁকে ছোটে। ফলে তাড়া করা শত্রু অনেক সময় সোজা ছুটে গিয়ে এদের ধরে ফেলে।

লম্বা উটের মতো গলা বলেই সবাই এদের বলে উটপাখি। ইংরেজি নাম ক্যামেল বার্চ বা অস্ট্রিচ। আফ্রিকা, সিরিয়া, আরব দেশ ও মিশরের মরুভূমি অঞ্চলে এরা দল বেঁধে চরে বেড়ায়।

পাখিদের মধ্যে এত বড় আকারের পাখি আর নেই। অতীতে এশিয়া মহাদেশেও এদের দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে এশিয়ায় এরা লুপ্ত। মাথা থেকে গলা অবধি, আর পায়ে এদের পালক নেই। বাকি শরীর বড় বড় পালকে ঢাকা। পুরুষ-পাখিদের পালকের রং কালো, স্ত্রী-পাখিদের খয়েরী। পুরুষ-পাখিদের ডানার বড় বড় সাদা ধপধপে পালকগুলো এক সময় আদিবাসীদের দেহসজ্জায় ব্যবহার করা হতো।

উটপাখিরা দল বেঁধেই ঘোরাফেরা করে। সাধারণত এরা ছোট ছোট গাছপালা খেয়েই বাঁচে। তবে এদের লম্বা ঠোঁটের জন্য ছোট ছোট মেরুদণ্ডীপ্রাণীও খেয়ে থাকে। লোকালয়ের আশেপাশে যে সব পাখি থাকে তাদের পাকস্থলি কেটে পাওয়া গেছে টাকা পয়সা, চাবির গোছা, তামাকের পাইপ। এদের ওজন দু'শ পাউন্ডের কাছাকাছি হয়। ডিম পাড়ার সময় স্ত্রী-পাখি দশ থেকে বারোটা ডিম পাড়ে। আর এক একটা ডিমের ওজন হয় প্রায় আড়াই

থেকে সাড়ে তিন পাউন্ডের মতো।

পাখিদের মধ্যে সবথেকে বড় যেমন উটপাখি, তেমনি সবথেকে ছোট পাখি হলো 'হামিংবার্ড'। মাত্র এক ইঞ্চির মতো চেহারা এদের। বড় গুবরে পোকা বা গঙ্গাফড়িংয়ের থেকেও আকারে এরা ছোট। এদের পা এতই কমজোরী যে বসা ছাড়া এরা পা দিয়ে আর অন্য কিছুই করতে পারে না। ওড়ার সময় এরা চট করে দিক পরিবর্তন করতে পারে, এমনকি দরকার পড়লে পাশাপাশি, এমনকি পেছন দিকেও উড়তে পারে। এরা লম্বা ঠোঁট দিয়ে উড়ন্ত অবস্থাতেই ফুলের মধু খায়। এত ঘনঘন পাখা নাড়ে যে মানুষের চোখে তা ধরাই পড়ে না। আর অত ঘনঘন পাখা নাড়ার জন্য একটা ভোমরার ডাকের মতো শব্দ ওঠে। তারজন্যেই এদের নাম হামিংবার্ড। পক্ষীবিশারদরা হিসাব করে দেখেছেন সাধারণভাবে ওড়ার সময় এরা সেকেন্ডে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর বার ডানা ঝাপটায়। সময় সময় তা ওঠে সেকেন্ডে দু'শো বারের মতো।

ফুলের মধুই এদের প্রধান খাদ্য। তবে ক্ষুদে পোকামাকড়ও এরা খেয়ে থাকে। তবে সে সব পোকামাকড় যখন ফুলের ওপর বসে থাকে তখন খায়। উড়তে উড়তে এরা পোকামাকড় ধরে খেতে পারে না।

নানান জাতের হামিংবার্ড দেখা যায়। এক এক জাতের জিবের গঠন এক এক রকম। ঠিক মতো খাবার দিলে খাঁচায় বন্দী পাখিরা অনেকদিন বাঁচে। এদের সাধারণত দেখা যায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তের হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে। ট্রপিক্যাল অরণ্যঅঞ্চলে এরা বাস করে। তিনশ উনিশ প্রজাতির হামিংবার্ডের খবর জানা গেছে। এদের পালকের নানান রংয়ের জন্য এক সময় এদের মেরে পালক দিয়ে মহিলাদের গহনা বানান হতো। এখন তা বন্ধ করা হয়েছে।

বাচ্চা হবার সময় মা-পাখিরা গাছের ডালে ছোট্ট কাপের মতো একটা বাসা বানায়। সেখানে সাদা ধপধপে দুটো ডিম পাড়ে।

এই হামিংবার্ডের এক প্রজাতি, যার ইংরাজী নাম রুবি থ্রোটেড হামিংবার্ড, তাদের উত্তর-পূর্ব আমেরিকায় দেখা যায়। তারা সময় সময় একনাগাড়ে উড়ে মেক্সিকো উপসাগরের ওপর দিয়ে আটশ কিলোমিটারের মতো পথ পাড়ি জমায়। না থেমে না কিছু খেয়ে কি করে যে অত ছোট্ট পাখিগুলো এ কাজ করে তা পক্ষীবিশারদরা আজও বুঝে উঠতে পারেননি।

আমেরিকার মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে এদের দেখা যায়। দেখা যায় টেরা-ডেল-কিউগোতেও। কিউবা, বাইনস্ দ্বীপেও এদের পাওয়া যায়। পাওয়া যায় আলাস্কা অঞ্চলে।

আর এক জাতের পাখি হচ্ছে পেঙ্গুইন। দক্ষিণ গোলার্ধেই এদের দেখা যায়। মেরুপ্রদেশ পর্যন্তই এদের বাস। এদের ডানা খুবই ছোট, তাই এরা উড়তে পারে না, কিন্তু ডানাকে কাজে লাগিয়ে জলে বেশ তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটতে পারে। স্থলে এরা মানুষের মতোই দুপায়ে হাঁটে। কিন্তু যখন বরফের ওপরে চলাফেরা করার দরকার হয় তখন প্রায়ই এরা বরফের ওপর উপুড় হয়ে পিছলে চলে। তখন কিন্তু ওই ডানার সাহায্যেই শরীরটাকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়। ডাঙার পাখি হলেও এরা জলে থাকতেই বেশি ভালবাসে। দক্ষিণমেরু সমুদ্র অঞ্চলেই এদের চলাফেরা।

নানা প্রজাতির পেঙ্গুইন আছে। তবে অধিকাংশ স্ত্রী-পেঙ্গুইন তুষারপাতের সময়ই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ে ওরা ওদের নির্দিষ্ট বাসায়, প্রতি বছর ঠিক একই জায়গায়। কয়েক প্রজাতি মাত্র একটা করেই ডিম পাড়ে, অন্য কয়েক প্রজাতি দুটো করে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার জায়গাটা তুষার সীমার বাইরে পাথুরে জায়গা, সেখান থেকে সাগরের দূরত্বও অনেক।

স্ত্রী-পাখিরা ডিম পেড়েই সাগরে চলে যায় খাবারের খোঁজে। তখন পুরুষ-পাখিরা সেই ডিমে তা দিতে বসে। দীর্ঘ ষাট দিন তা দিয়ে বাচ্চাকে পৃথিবীর আলো দেখায়। বাচ্চা যখন জন্মায়, তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এসে গেছে। ডিম ফোটার সময়

মা-পাখি সাগর থেকে ফিরে আসে। পুরুষ-পাখিটা তখন যায় সাগরে খাবারের খোঁজে। এর জন্য তাদের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের সমুদ্রেও যেতে হতে পারে। মা-পাখিই তখন বাচ্চাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব নেয়।

সব থেকে বড় জাতের পেঙ্গুইনের নাম এমপারার পেঙ্গুইন। এক দশমিক দুই মিটারের মতো এদের উচ্চতা। ওজন প্রায় চৌত্রিশ কিলোগ্রাম। আর সব থেকে ছোট জাতের পেঙ্গুইন হলো নিউজিল্যান্ডের ফেয়ারী পেঙ্গুইন। এদের উচ্চতা ছত্রিশ সেন্টিমিটারের মতো। প্রধানত দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এদের দেখা গেলেও এক প্রজাতিকে দেখা যায় গ্যালা প্যাগোসের দ্বীপপুঞ্জে। গ্যালা প্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ তো প্রায় বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চল। এই প্রজাতিকে বলা হয় গ্যালাপ্যাগোস পেঙ্গুইন।

যত পাখি ডাকে ও ওড়ে তাদের মধ্যে সেরা কিন্তু বেনেবউ। ইংরেজি নাম গোল্ডেন ওরিওল বা ম্যাঙ্গোবার্ড। উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের বলে অনেকে একে হলদে পাখিও বলে। ভারতবর্ষ ছাড়াও ইউরোপের নানাস্থানে বিশেষত ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালিতে এদের দেখা যায়। খ্যাতনামা সাহিত্যিক বনফুল এর নাম দিয়েছিলেন 'কনকপাখি'। এরা মিষ্টি গলায় 'বউ কথা কও', 'পিউ-পিউ', 'গৃহস্থের খোকা হোক' ডাকের অনুকৃতিতে ডেকে ওঠে। দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে গুইড-গাইড নামে একপ্রকার পাখি দেখা যায়। এরা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ শব্দ করে ডাকে। আবার দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো থেকে আর্জেন্টিনার মধ্যে জ্যাবিরু নামে একধরনের সারস পাখি আছে—যারা ডাকতেই পারে না। কেবল ঠোঁট দুটো দিয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে।

পৃথিবীর দক্ষিণ সাগরের উপকূলে 'অ্যালবাট্রস' নামে একপ্রকার নিরীহ পাখি দেখা যায়। এরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ডানাওলা পাখি। বিশাল ডানার সাহায্যে দিনের পর দিন দূর সমুদ্রের উপর শত শত মাইল উড়তে পারে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, তুফান কোনো কিছুই এদের থামাতে পারে না। শুধু ডিম পাড়ার জন্য এরা পাহাড়ে নামে। অ্যালবাট্রসরা মাত্র ২২ দিনে ৩৩৯৭ মাইল আকাশপথে পরিক্রমা করতে পারে। এই পাখিদের ঘিরে নাবিকদের মধ্যে একধরনের সংস্কার আজও বর্তমান। পৃথিবীর সব নাবিকরাই বিশ্বাস করে যে, এই পাখি মারলে নাবিকদের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসে। কারণ একজন নাবিক মারা গেলে তার আত্মা নাকি অ্যালবাট্রস পাখির রূপ নেয়।

ইউরোপে হোমার নামে একজাতীয় পায়রা পত্রবাহকের কাজ করত। আমাদের দেশের রাজস্থানী ময়ূরের মতো উত্তর আমেরিকার টার্কি বা পেরুর নাচও দেখবার মতো। এরাও নাচার সময় লেজের পালকগুলো পাখার মতো ছড়িয়ে দিয়ে ডানার পালকগুলো কখনো ফুলিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে এমন অদ্ভুতভাবে নাচে যা সকলকে আকৃষ্ট করে।

অনুকরণে যে পাখির নামটি সবার আগে আসে, সে হলো মকিংবার্ড বা অনুকারী পাখি। এদের জন্মস্থান আমেরিকা। বিভিন্নরকম জীবজন্তু ছাড়াও হাতুড়ি মারার শব্দ, গাড়ি চলার শব্দ, ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ, এক কথায় প্রায় সব রকমের শব্দ নকল করতে মকিংবার্ড-এর জুড়ি মেলা ভার। তবে অস্ট্রেলিয়ার লায়ার পাখিও হরেকরকম পশুপাখির ডাক নকল করতে পারে। এরা খুব লাজুক পাখি। সারাদিন ঝোপে, জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। সুন্দরবন, ছোটনাগপুর, আসাম অঞ্চলের আরেকরকম পাখি ভীমরাজ আর কেশরাজ গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস ও মুরগীর ডাক খুব নিখুঁতভাবে নকল করতে পারে। আবার কাল-পেঁচার ডাকের অনুকরণে নাইটজার পাখি ডাকে। এদের অনেকে ঠুকঠুকিয়া বলে।

পৃথিবীর এক আজব অথচ লুপ্তপ্রায় পাখি হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের কিউই বা আপটেরিক্স। এদের ডানা নেই! সমস্ত দিন গর্তের মধ্যে বা গাছের শিকড়ের নিচে লুকিয়ে থাকে। রাত্রি হলে তবেই এরা খাবারের সন্ধানে বের হয়। এরা জল পান করে না। বছরে একটিমাত্র ডিম পাড়ে যা আবার ভীষণ হাল্কা!

ডিম পাড়ার কথা এলে ফ্লিকার-এর নাম করতে হয় আগে। এদের ডিম পাড়ার অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতা দেখলে অবাক হতে হয়। এক পক্ষিবিজ্ঞানী ফ্লিকার পাখির বাসা থেকে ওর অজ্ঞাতে রোজ একটি করে ডিম সরিয়ে দেখেছিলেন যে, ফ্লিকারটি ৭৩ দিনে ৭১টি ডিম পেড়েছিল।

কোকিল যে পরের বাসায় ডিম পাড়ে সে প্রসঙ্গে প্লিনি বলেছেন, 'কোকিল জানে, সে অন্য পাখিদের চক্ষুশূল। তাদের কোপে এবং আক্রমণে যাতে নির্বংশ না হতে হয়, তাই আত্মগোপন শ্রেয় বিবেচনা করেই বাসা-বাঁধায় উদ্যোগী হয় না কোকিল।' আর সবথেকে আশ্চর্যের বিষয়, স্ত্রী-কোকিল যখন যে বাসায় ডিম পাড়ে, তা দেখতে হয় ঠিক পালিকা-মাতার নিজের ডিমের অনুরূপ। আরও এক মজার ব্যাপার, অন্য পাখিরা ডিম পাড়ে সাধারণত ভোরে। কিন্তু কোকিলের ডিম পাড়ার সময় হলো দুপুরে, অন্য পাখির অনুপস্থিতির সুযোগে। কোকিলের মতো পাপিয়া পাখিও পরের বাসায় ডিম পাড়ে। 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' রবে এরা বিরামহীনভাবে গান করে চলে। এজন্যই ইংরেজিতে এদের ব্রেন-ফিভার বার্ড বলে।

অপরের বাসায় ডিম পাড়ার মতো অপরের বাসায় ঢুকে গোপনে ডিম খেয়ে নেওয়ার বদনাম আছে হাঁড়িচাচার। ইংরেজিতে এদের ম্যাগপাই বলে। এরা বেশি খায় ঘুঘুর ডিম। ঘুঘুর অনুপস্থিতিতে ডিম চুরি করে খেয়ে পালায়। তাই এদের আর এক নাম চোর-পাখি। খাওয়ার ব্যাপারে কসাই পাখির একটি দিক লক্ষ্য করার মতো, এরা যতটা খায়, তার থেকে অনেক বেশি শিকার করে কাঁটায় গেঁথে রেখে দেয় পরে খাবার জন্যে।

এরকম কত বিচিত্র কাণ্ডকারখানা প্রতিনিয়তই ঘটছে প্রকৃতির রাজ্যে।

ছবিঃ ধ্রুব রায়

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

তা পুজো সংখ্যা কেমন লাগলো বলো। আমি তো তোমাদের চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে আছি। মনে রেখো তোমাদের প্রশংসা, তোমাদের সমালোচনা এমনকি তোমাদের নিন্দার দাম আমাদের কাছে অনেক। কার লেখা কেমন লাগলো সে কথাটা জানাতে ভুলো না কিন্তু।

এবার বলো পুজো কেমন কাটলো। নতুন জামা-কাপড় পরে কে কটা ঠাকুর দেখলে? কোথাকার ঠাকুর সবচেয়ে ভালো লেগেছে? ঠাকুর দেখার সময় মা দুর্গা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের বাহনদের কেমন দেখলে? ওদের কথা পড়তে চেয়েছিলে বলে শুকতারার পুজো সংখ্যায় তা ছাপা হয়েছে। পড়েছো নিশ্চয়ই।

ওদিকে কালী পুজো আসছে। দুমদাম বাজির শব্দে তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। দুর্গা পুজোর পর যখন মন খারাপ হয়ে যায় তখন মনে হয় কালী পুজো আসছে। কালী পুজোর পরই তো ভাইফোঁটা। কী মজা! কিন্তু তারপর? তারপর সেই সরস্বতী পুজো। তার তো অনেক দেরি।

কালী পুজো প্রায় এসে গেলো। আচ্ছা কালী ঠাকুর সম্বন্ধে তোমরা কি জানো বলো দেখি? নিশ্চয়ই কালীমূর্তির বর্ণনা দেবে। কিন্তু তা তো নয়। তবে শোন বলি। মহাদেব সতীকে দক্ষযজ্ঞে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু বাপের বাড়িতে অতো বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে আর তিনি যাবেন না, এ কখনো হতে পারে, নেমন্তন্ন হয়নি তাতে কি, নিশ্চয়ই বাবা ভুলে গেছেন। কিন্তু মহাদেব বেঁকে বসেছেন। বিনা আমন্ত্রণে তিনি সতীকে কিছুতেই যেতে দেবেন না। তখন সতী প্রথমে কালীমূর্তি ধারণ করে শিবঠাকুরকে ভয় দেখাতে গেলেন। কিন্তু শিবঠাকুর কি আর ভয় পাবার পাত্র! কালীমূর্তি দেখে মহাদেব ভয় পেলেন না দেখে সতী দশ দিক থেকে দশ মূর্তি (কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা) ধারণ করে মহাদেবের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। দশমূর্তিতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন বলেই এঁদের নাম দশমহাবিদ্যা। দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা হলেন কালী। শক্তি উপাসকরা কালীকে আদ্যাশক্তি বলে উপাসনা করেন। এঁর চারটি হাত। দুই ডান হাতে মুগুর তার মাথায় নরকপাল বসানো ও খড়্গ আর বাঁ হাতে ঢাল ও দড়ির ফাঁস বা খাঁড়া। গলায় নরমুণ্ড। কালী ঠাকুরের অবশ্য আরো অনেক রূপ আছে। আদ্যা কালী, শ্যামা কালী, শ্মশান কালী ইত্যাদি। বড় হয়ে তোমরা সব জানবে, পড়বে। এখন কালী ঠাকুর সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হলো তো। এতেই হবে।

তারপর তোমাদের আর সব খবর বলো। শীত আসছে। হাওয়া এবার দক্ষিণ দিকের বদলে উত্তর দিক থেকে বইতে শুরু করেছে। প্রকৃতি তার নিয়মের এতোটুকুও হেরফের হতে দেয় না। প্রকৃতির কাছ থেকে এই শিক্ষাই আমাদের নেওয়া উচিত তাই নয় কি। কিন্তু তা আমরা নিই কই। উল্টে গাছ কেটে, পরিবেশ দূষিত করে তুলে আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছি। নানারকম অসুখ-বিসুখও ছড়াচ্ছে। অনেক প্রাণী, অনেক জন্তু হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী থেকে। এর ফল কিন্তু ভয়াবহ। বিজ্ঞানীরা তা বুঝেছেন বলেই সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। কিন্তু তাতেও কি আমরা কান দিচ্ছি! তোমরা শুকতারার বন্ধুরা কিন্তু ভুলো না। যতো পারো গাছ লাগাও। কেউ গাছ কাটলে আপত্তি জানিও। আর তোমাদের পক্ষে যতোটা সম্ভব পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার চেষ্টা করো। তাহলেই হবে।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই!

ভালো থেকো সকলে? অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

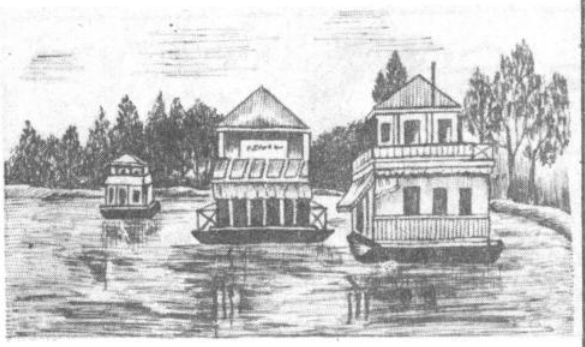

সুকান্ত সরকার, বয়স পনেরো, নবম শ্রেণী, নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতন, চব্বিশ পরগণা

ছবি আঁকা

রতন একদম আঁকতে পারে না। এই তো কদিন আগে বাবাকে বলে একটা পেন্টিং বক্স কিনেছে। একটা সুন্দর ছবি এঁকেছে, ওটা রং করবে বলে। ছবিটা মাকেও দেখিয়েছে। রতনের মা ছবিটা দেখে ভেবেছিলেন যে, বোধহয় কোনো গরুর ছবি, কিন্তু রতন বলল, ওটা নাকি বাঘের ছবি। তাই ছেলের মনে ব্যথা না দিয়ে মা বললেন, 'বাঃ! খুব সুন্দর হয়েছে।' কয়েকদিন আগে ড্রইং ক্লাসে প্রজাপতি এঁকেছিল রতন। কিন্তু ড্রইং স্যার দেখে ভাবলেন বোধহয় শুঁয়োপোকার ছবি। তাই ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'তুমি এবার থেকে শুঁয়োপোকা আঁকতে চেষ্টা করবে, তাহলে দেখবে তুমি কি সুন্দর প্রজাপতি এঁকেছ।'

একদিন রতন হাঁটতে হাঁটতে স্কুল যাচ্ছে। বস্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় খেয়াল করল একটা ছেলে কাগজে রং করছে। খুব কৌতূহল হওয়াতে কাছে গিয়ে দেখে ছেলেটা খুব সুন্দর একটা বাঘের ছবি এঁকেছে। কিন্তু রং কেনার পয়সা না থাকায় আলতা দিয়ে ছবিটা রং করছে। তাই দেখে রতন ভাবল আমি ছবি আঁকতে পারি না, অথচ রং কিনে শুধু নষ্ট করি আর এই ছেলেটা আঁকতে পারে, কিন্তু রং কেনার পয়সা নেই। ঠিক আছে আমি আমার পেন্টিং বক্সটা একে দিয়ে দেব। পরদিন স্কুল যাবার সময় পেন্টিং বক্সটা ছেলেটাকে দিতে চাইল রতন। ছেলেটা তো কিছুতেই নেবে না। রতন জোর করে তার হাতে বক্সটা গুঁজে দিল। ছেলেটার অবাক দৃষ্টি দেখতে দেখতে খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল।

শান্তনু বিশ্বাস,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
সোদপুর হাই স্কুল, ২৪ পরগনা (উঃ)

কিশোর দল

আকাশ রয়েছে মাথার উপরে
পায়ের তলায় জমি,
কিশোর জীবনে কত না স্বপ্ন!
জানেন অন্তর্যামী।
আজিকে আমরা ছোট রয়েছি
কালকেই হব বড়,
এই জীবনের চলার পথটা
করবই সড়গড়।
চলব আমরা পাহাড় ডিঙিয়ে
সাঁতরে যাব নদী,
প্রাণ দিয়ে দেব পরের জন্য
প্রয়োজন হয় যদি।
শত্রুকে মোরা মিত্র করব
দিয়ে প্রেম ভালবাসা,
মানুষের মতো মানুষ হবই
এই আমাদের আশা।

অপরাজিতা বিষয়ী,
বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
মেমারী রসিকলাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়, মেমারী, বর্ধমান

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

নিরক্ষরতার ভয়াবহতা
সবাই বুঝেছে আজ,
নিরক্ষর থাকলে পরে
দেশের দশের লাজ।
সাক্ষরতা জ্বালবে তাদের
জীবনপথের দীপশিখা,
জ্ঞানের আলোয় কাটবে আঁধার
পরবে তারা জয়টিকা।
নিরক্ষর রাখব না আর
এই হোক মোদের অঙ্গীকার,
নিরক্ষরদের জন্য মোরা
খুলে দেব শিক্ষার দ্বার।

জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ ঠাকুর
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
বাঁকুড়া জিলা স্কুল

দ্বৈপায়ন সাহা,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী,
দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাইস্কুল, চুঁচুড়া

পিয়াস চক্রবর্তী, বয়স ছয়, প্রথম শ্রেণী,
দমদম কিশোর ভারতী বিদ্যালয়, কলকাতা

সঞ্চারী মৈত্র, বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী, কল্যাণী
ইউনিভার্সিটি এক্সপেরিমেন্টাল হাই স্কুল, নদীয়া

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

এক গ্রামেতে রাম ও রহিম থাকত পাশাপাশি,
সারাদিনই তাদের মুখে থাকত লেগে হাসি।
কিন্তু হঠাৎ কালো সে ঝড় বয়ে গেল গ্রামে,
সবার মুখে দুর্দশারই কালো ছায়া নামে।
রাম ও রহিম ঝগড়া করে, কয় না কোনো কথা,
কেউ কখনো বুঝলো নাকো তাদের মনের ব্যথা।
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এল, গেল তাদের হাসি,
রাম ও রহিম এক সাথেতে বাজায় না আর বাঁশি।

এসো সবাই হাত যে মেলাই মৈত্রীরই বন্ধনে,
মোদের ক্ষতি করতে যেন না পারে দুর্জনে।
মুসলিম ও হিন্দু মোরা সবাই ভ্রাই-ভাই,
তাই তো মোরা দাঙ্গা নয়, সবাই শান্তি চাই।
রাম ও রহিম কইবে কথা, থাকবে পাশাপাশি
তাদের মুখে দেখা দেবে শান্তির এক হাসি।

সুপর্ণা সাহা, বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী,
কল্যাণী ইউনিভার্সিটি
এক্সপেরিমেন্টাল হাই স্কুল, নদীয়া

দুর্গাপূজা

এল আবার দুর্গাপূজা
বছর পরে, আঃ! কী মজা!
নতুন জামা, নতুন জুতো,
আরও নতুন রকম কত!
ষষ্ঠীর দিন পরব স্কার্ট,
দাদা পরবে ব্যাগি প্যান্ট শার্ট।
সপ্তমীতে বন্ধুরা সব
ঘুরব কত পূজা মণ্ডপ!
নবমীর দিন দুঃখ হবে
পরদিন যে ঠাকুর যাবে!
দশমীর দিন বলতে হবে,
আসছে বছর আবার হবে।
কিন্তু এখন আসছে পূজা,
হরেক হরেক রকম মজা!
বছর পরে আসছে আবার
মুজায় ঠাসা দুর্গাপূজা।

পপি ভট্টাচার্য,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, দক্ষিণ
পূর্ব রেলওয়ে মিশ্র উচ্চ বিদ্যালয়

শুভ বিজয়া

সাঙ্গ হলো পূজার খেলা,
সাঙ্গ কলরব।
উঠলো জেগে সবার মনে
মিলন মহোৎসব।
তাইতো জানাই গুরুজনে
প্রণাম-নমস্কার,
আশিস জানাই ছোট যারা,
তাদের বিজয়ার।
দাদুমণি 'শুকতারাতে'—
মেটাও সবই আশা।
তাইতো জানাই তোমায় আমি
বুকের ভালোবাসা।

সমর্পণ ভট্টাচার্য,
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী,
বীরভূম জেলা স্কুল, সিউড়ী।

অনির্বাণ মৈত্র,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ, কোন্নগর

নন্দিনী রায়
দ্বিতীয় শ্রেণী,
বয়স সাত, ক্রাইস্ট চার্চ
গার্লস হাইস্কুল কলকাতা

যুগ-যুগান্তের যাত্রী — ময়ূখ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গর্‌র্‌!
ইঁয়্যাও্‌!
একটা রক্ত-জল-করা গর্জন — পরক্ষণেই জন্তুটা একলাফে নেমে এল পাঁচিল থেকে, তার জ্বলন্ত দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ হয়েছে ছুরি-হাতে মানুষটার দিকে! দারুণ আতঙ্কে ছুরি ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল আততায়ী...
সাংঘাতিক জানোয়ার! ছুরি এখানে কোন কাজেই লাগবে না। কোথা থেকে এল এই বিদঘুটে জন্তু? বাঘের মতো দেখতে — কিন্তু বাঘ কি কালো হয়?
৮-৪

(চলবে)

ভালুকের লেজ নেই

দেবযানী কর

অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন নাকি পশুরাজ সিংহ ছাড়া আর কারুর লেজ ছিল না। লেজের অভাবে পশুদের ভারী কষ্ট। কেন জানো? মশা, মাছি হরদম গায়ে বসত, আর একবার বসলে তাদের তাড়ায় কার সাধ্যি। এখনকার মতো তো নয়, যে লেজ দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।

এখন প্রজাদের এত কষ্টের কথা শুনে পশুরাজ সিংহের মনে খুব কষ্ট। উনি ঠিক করলেন, সব পশুর লেজের ব্যবস্থা করতে হবে। শুরু হলো লেজের জন্য পশুরাজের তপস্যা। তারপর একদিন দেবতা তুষ্ট হয়ে বললেন, "তুমি বিভিন্ন রকম লেজ তৈরি করে এক এক পশুকে দেবে, তাহলেই সেই জাতের সব পশুদের সেইরকম লেজ হবে।"

দেবতার বরলাভ করে পশুরাজ সিংহ তৈরি করলেন নানারকমের

লেজ—সরু, মোটা, ঝাঁকড়া—কতরকম।

লেজ তৈরি শেষ হলে পশুরাজের আদেশে, তাঁর পেয়াদারা জঙ্গলে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বেড়াতে লাগলো—

আগামী রবিবারে
পশুরাজের দরবারে
দেওয়া হবে লেজ।
পৌঁছে যেও তাড়াতাড়ি
মনের সুখে ফিরো বাড়ি
ঘুচিয়ে মনের ক্লেশ।

পশুরাজের পেয়াদারা জনে জনে, প্রতিক্ষণে জানাতে লাগল পশুরাজের ঘোষণা। ভালুক ছিল ঘুমিয়ে। তোমরা তো সবাই জানো ভালুক কেমন ঘুমাতে ভালোবাসে। তাকেও ঠেলা মেরে জাগিয়ে দিয়ে বলে গেল।

রবিবারের সকালে, দলে দলে পশুরা চললো পশুরাজের আস্তানায়। শেয়াল তো সবচেয়ে চালাক, তাই না? সে ঠিক সবার আগে পৌঁছে, দেখে শুনে সবচেয়ে সুন্দর যেটা মনে হলো, সেই লেজটাই লাগিয়ে নিয়ে চলে গেলো।

শেয়ালের পরেই এলো কাঠবেড়ালী। শেয়ালের মতোই সুন্দর তবে ছোট একটি লেজ সে পেলো। লেজ লাগিয়ে তার কি আনন্দ! লাফিয়ে লাফিয়ে সে ফিরলো তার বাসার দিকে। গাছের ডালে চড়ে শুরু হলো তার নাচ আর গান—

তা ধিন ধিন তা
সবাই এসে দেখে যা
লেজের আমার কেমন বাহার
এসেছে দিন রূপ দেখাবার
তেটে ধিন ধিন তাক
সবাই এসে দেখে যাক।

এরপর এলো ঘোড়া। সে এসে পুরোটাই চুলে ভরা লেজ নিলো। লেজ লাগিয়ে মনের সুখে ডেকে বলল—

চিঁহি হি হি, চিঁহি হি হি
আর ডরাই না মশা মাছি-ই-ই
বসলে গায়ে লেজের বাড়ি
মারব টেনে সরাসরি-ই।

বলতে বলতে টগবগ করতে করতে চলে গেল।

তারপর এলো খট্টাশ। সেও এক ঝাঁকড়া লেজ নিলো। শুয়োর এসে সরু কোঁকড়া এক লেজ নিলো। সম্বর হরিণ এসে নিলো এক লম্বা লেজ। এইভাবে সব জন্তুরা একে একে লেজ নিয়ে গেলো।

তারপর হাতি এলো থপথপিয়ে, শুঁড় দুলিয়ে। পশুরাজের গালে হাত। বড় বড় লেজ আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। কি আর করা যায়। পড়ে থাকা লেজের মধ্যে সরু একগাছি দড়ির মতো লেজ ছিলো, সেটাই দিলেন লাগিয়ে। অত বড় শরীরে লেজটি অবশ্যই মানানসই হলো না।

খরগোশ এলো আরও বেলা করে। ঘুমিয়ে চোখদুটো লাল। পশুরাজ বললেন, "এত দেরি করলে, আমার কাছে তো এই ছোট্ট লেজটি ছাড়া আর কিছুই নেই।"

খরগোশ বললে, "এটাই ভাল হবে প্রভু।" এই বলে ছোট্ট লেজখানি লাগিয়ে চলে গেল।

খুশিতে ভরপুর,
চলে গেল বহুদূর।

দিন শেষ, লেজও শেষ। পশুরাজ সিংহ সবাইকে লেজ দিয়ে মনের সুখে ঘুম লাগালেন।

এদিকে হয়েছে কি ভালুক তো অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে পশুরাজের বাড়ি আসার পথে দেখতে পেয়েছিলো এক মস্ত মৌচাক। মৌচাক দেখে, ভালুক গেছে লেজের কথা ভুলে। সে মনের আনন্দে মধু খেলো পেট ভরে। ভরা পেটে তার মনে পড়ল পশুরাজের দরবারে যাওয়ার কথা। কিন্তু মুখে হাতে মধুমাখা অবস্থায় যাওয়া ঠিক নয় বিবেচনা করে সে ঠিক করলো স্নান করে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

নদীতে স্নান করে ভালুক ভাবলো, ভিজে গা একটু শুকিয়ে নিই। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ভালুক নদীর পাড়ে শুয়ে পড়লো। শুয়েই লম্বা ঘুম । ঘুম ভাঙলো যখন সুয্যিমামা প্রায় পাটে বসেছে।

দৌড়াতে দৌড়াতে ভালুক সিংহমশায়ের দরবারে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই, লেজও নেই, সব লেজ বিলি হয়ে গেছে।

রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ভালুক চললো বাসার দিকে। পথে দেখল খট্টাশ তার নতুন পাওয়া লেজ নিয়ে মহা আনন্দে সাদা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গান গাইছে—

পশুরাজ কি মহান
দেখে যান, দেখে যান,
সবার ঘরেই খুশির বান,
তাইতো আমি গাইছি গান।
আনন্দে ভরা প্রাণে,
তাইরে নাইরে না রে।

এই দেখে ভালুকের আরও রাগ হলো, সে ছুটে গেলো খট্টাশের লেজ খাবলে নিতে। খট্টাশ ছুটে পালালো। ভালুকের হাতে খট্টাশের লেজের একটুখানি ডগা রয়ে গেলো। ভালুক সেই ডগাটুকু লাগিয়ে মনের সুখে মধু খেতে চলে গেল।

এদিকে খট্টাশ ছুটেই চলেছে। কোথায় যায়, কোথায় লুকায় এই ভাবনায় অস্থির। ভালুক যদি লেজ নিয়ে যায়? শেষ পর্যন্ত সে মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে গিয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই থেকে খট্টাশ মাটির তলায় থাকে, রাত্রে গর্তের বাইরে আসে খাবারের খোঁজে। তার পিঠে রয়ে যায় ভালুকের নখের টানা কালো দাগ।

একদিন শেয়াল এক গর্তের কাছে নাক ডাকার আওয়াজ শুনে উঁকি মেরে দেখে, খট্টাশ ঘুমিয়ে। সে ডেকে বললে, "ওকি ভাই, এমন সুন্দর রোদ বাইরে আর তুমি কিনা গর্তের মধ্যে?"

তখন খট্টাশ তার সব কথা বললে শেয়ালকে। শুনে শেয়াল বললো—

ওরে বাবা
ভালুক দুরাত্মা
নিতে পারে মোর লেজটা,
সেরা লেজটা।
অতএব সাবধান
হওয়া চাই
লেজহীন ভালুকেরে
বিশ্বাস নাই।
দেয় যদি লেজে টান
ঠিক জানি যাবে প্রাণ,
এইবেলা সটকান দেওয়া চাই,
দিই ভাই।

শেয়ালও মাটির উপরে বাস করা নিরাপদ নয় ভেবে গর্ত খুঁড়ে বাস করতে শুরু করল। সেই থেকে সেও গর্তে থাকে, রাত্রে বেরোয়। আর ভালুক? আজও তার লেজ নেই। খট্টাশের লেজের ডগাটুকু শুধু আটকে আছে।

(বাইলোরুশিয়ান রূপকথার ছায়া অবলম্বনে)

ছবি: সুফি

পুরস্কার

রঞ্জন প্রসাদ

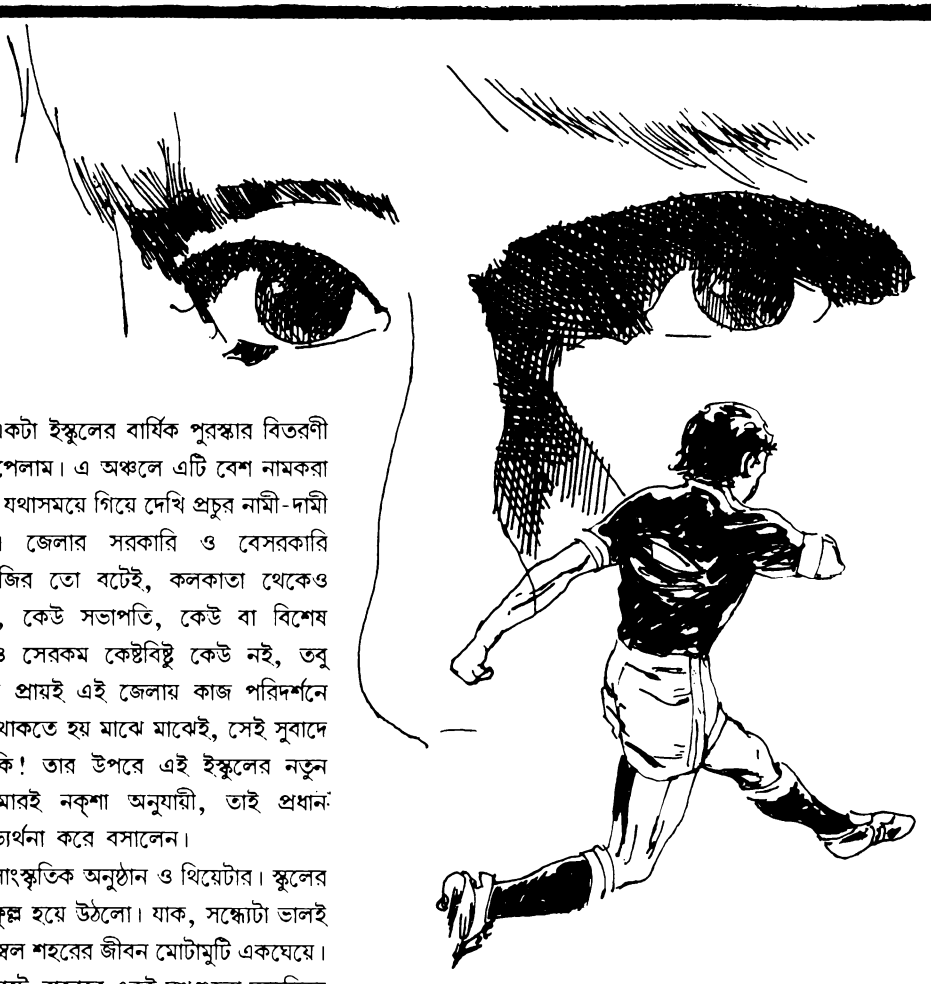

মালদহ জেলার একটা ইস্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় নিমন্ত্রণ পেলাম। এ অঞ্চলে এটি বেশ নামকরা সাবেকী ইস্কুল। যথাসময়ে গিয়ে দেখি প্রচুর নামী-দামী মানুষের সমাগম হয়েছে। জেলার সরকারি ও বেসরকারি হোমরা-চোমরা সকলে হাজির তো বটেই, কলকাতা থেকেও বিশিষ্ট মানুষেরা এসেছেন, কেউ সভাপতি, কেউ বা বিশেষ অতিথি হয়ে। আমি যদিও সেরকম কেষ্টবিষ্টু কেউ নই, তবু একজন ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে প্রায়ই এই জেলায় কাজ পরিদর্শনে আসতে হয়, ডাকবাংলোয় থাকতে হয় মাঝে মাঝেই, সেই সুবাদে মুখচেনা না হয়ে উপায় কি! তার উপরে এই ইস্কুলের নতুন দালানটা তৈরি হচ্ছে আমারই নক্‌শা অনুযায়ী, তাই প্রধান শিক্ষকমশাই আমাকেও অভ্যর্থনা করে বসালেন।

পুরস্কার বিতরণের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও থিয়েটার। স্কুলের ছেলেরাই করবে। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। যাক, সন্ধ্যেটা ভালই কাটবে। এমনিতেই তো মফস্বল শহরের জীবন মোটামুটি একঘেয়ে। কি অফিস-কাছারিতে, কি হাটে-বাজারে একই মুখগুলো ঘুরেফিরে দেখতে হয়, একই ধরনের কথাবার্তা আলাপ আলোচনা চলে। কখনো বা দেঁতো হাসি, কখনো বা পদমর্যাদার লড়াই। এরই মাঝে একদল অল্পবয়সী ছেলের সরব উচ্ছ্বাস ও নানাবিধ কর্মকাণ্ড অর্থাৎ নাচ-গান-আবৃত্তি ও নাটক যে খুবই চিত্তাকর্ষক লাগবে তাতে আর সন্দেহ কি? নিজের আসনে বসে তাদের শশব্যস্ত ছোটাছুটি দেখতে দেখতে নিজের স্কুলজীবনের কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো।

চিরকেলে রেওয়াজ মতো উদ্বোধনী গান, সভাপতি ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গের বক্তৃতা ইত্যাদির পালা সাঙ্গ হলে শুরু হলো পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। একে একে নাম ডাকা হতে লাগলো আর ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে ক্লাস টেন পর্যন্ত ছাত্ররা আলোকিত মঞ্চের উপর এসে দর্শকদের করতালির মধ্যে তাদের সাফল্যের পুরস্কার নিতে লাগলো সভাপতির হাত থেকে। প্রত্যেক সফল ছাত্রের পক্ষেই এটা একটা স্মরণীয় দিন, এ তো খুবই স্বাভাবিক। তবে মনে হলো ব্যাপারটা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের বাবা-মায়ের কাছে, সন্তানগর্বে যাঁরা গর্বিত। সাফল্যের গজকাঠিই বোধহয় তাঁদের কাছে সন্তানের উন্নতি মাপার একমাত্র উপায়। সেই বাবা-মায়েদের উপস্থিতি, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা বেশ চোখে পড়ল।

সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে ক্লাস এইটের একটি ছেলেকে বিশেষ করে দেখা গেল। বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম হয়েছে সে। ইতিহাস, ভূগোল, ইংরাজী, গণিত—এগুলোতে সে আলাদা করে প্রথম পুরস্কার পেল, সব মিলিয়েও সে-ই ক্লাসে ফার্স্ট। মেডেল আর বইতে তার পেট থেকে গলা অবধি ঢেকে গেল। বেশ সপ্রতিভ চেহারা। আশেপাশের লোকদের বলাবলিতে বুঝতে পারলাম সে এখানকারই একজন ডাকসাইটে এ ডি এম অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলা-হাকিমের ছেলে। বাপকা বেটাই বটে। প্রতিবার পুরস্কার নেবার সময় তার মুখে ফুটে উঠলো এক ধরনের আত্মপ্রত্যয়ের গর্বমিশ্রিত বিজয়ীর হাসি, যেন এই পুরস্কারগুলো যে তার প্রাপ্য, এতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

পুরস্কার বিতরণ শেষ হলে ড্রপসিন পড়লো। অল্প সময়ের বিরতি, তারপরেই শুরু হবে ছাত্রদের বিচিত্রানুষ্ঠান ও নাটক। ইত্যবসরে আমি হলের লোকজনের ভিড় থেকে বেরিয়ে একটু খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম, প্রায়ান্ধকার ইস্কুলের মাঠটায়।

আশ্বিনের শুরু, কিন্তু গুমোট ভাব কাটেনি এখনো। এখানে ওখানে কাশফুল ফুটে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ, পুজোরও আর দেরি নেই।

ইস্কুলবাড়ির নির্মীয়মান দালানটা অন্ধকারে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। দোতলা অবধি গাঁথা। এবার তেতলার ছাদ ঢালাই হবে। একতলায় একটা টিমটিমে বাতি জ্বলছে, সেখানে ইট, বালি আর সিমেন্টের বস্তা ডাঁই করা থাকে। চৌকিদাররা ঠিকমতো পাহারা দেয় কিনা সেটা এই অসময়ে অতর্কিতে ভিতরে ঢুকে দেখা যেতে পারে, এই মনে করে এক-পা দু-পা এগিয়েছি, এমন সময় প্রেক্ষাগৃহের ভিতর থেকে দুটি ছেলে বেরিয়ে এসে দেয়ালে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। হলঘরের বাইরের আলোটা তাদের মুখের উপর পড়েছে, তাই এখান থেকেও তাদের স্পষ্ট দেখা গেল। একজনকে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম, সেই ফার্স্ট বয়টি, দুহাতে তার গাদা করা প্রাইজের বই, গলায় মেডেলগুলো ঝকঝক করছে। পাশের ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার হাত থেকে সেগুলো নিয়ে একে একে আনন্দের সঙ্গে দেখতে লাগলো। দুজনের মুখের আদলে কি আশ্চর্য মিল, যদিও দ্বিতীয় জন ততটা সুসজ্জিত নয়, চুলগুলো অবিন্যস্ত, পোশাক বিস্রস্ত, মাথায় যদিও সে কিছুটা উঁচু, মুখটিও কৃশ ও ম্লান, তবু অদ্ভুত সামঞ্জস্য। খটকা লাগাতে আমি আর ঐ অসমাপ্ত বাড়ির ভিতরে ঢুকতে গিয়েও ঢুকতে পারলাম না, একটা গাছের আড়ালে সরে গিয়ে ওদের দেখতে লাগলাম।

বইগুলো নেড়েচেড়ে ওদের দেখা শেষ হয়েছে কি হয়নি, এমন সময় হলঘরের বারান্দাটা থেকে একটা গলাখাঁকারির আওয়াজ পেয়ে ওরা চমকে সেদিকে তাকালো। দেখি একজন স্থূলকায় মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ভারী বুটজুতোর আওয়াজ তুলে সিঁড়ির চারটে ধাপ পেরিয়ে ওদের দিকে নেমে এলেন। মহার্ঘ স্যুটে আচ্ছাদিত তাঁর দেহ, হাতে একটা কাজ করা বাঁধানো ছড়ি, কেশবিরল মাথা, মোটা ভুরুর নিচে ভারী চশমার আড়ালে চোখ দুটোয় কি ভীষণ রাগের অভিব্যক্তি। ছড়িটা তুলে ধরে দ্বিতীয় ছেলেটিকে ইঙ্গিত করে চাপা গর্জনে তিনি বলে উঠলেন—'তুমি কেন এসেছ এখানে, তোমাকে না আমি আসতে বারণ করেছিলাম...'

ছেলেটির চোখ দুটি বিস্ফারিত, যেন আতঙ্কে বোবা হয়ে গিয়েছে। কোনোরকমে আমতা আমতা করে সে বলল—'ছোটু সকলের সামনে এতগুলো প্রাইজ পাবে, না দেখে থাকতে পারলাম না, তাই.....আমি এখুনি চলে যাচ্ছি বাবা.....'

'থাক', চাপা ধমকে দুলে উঠলো তাঁর মেদবহুল বপু—'আর আহ্লাদ করে বাবা বলে ডাকতে হবে না। পরীক্ষায় যে জঘন্য রকম ফল তুমি করেছ, তাতে আমার ছেলে বলে কারো কাছে আর পরিচয় দিও না। তুমি আমাদের লজ্জা, বুঝেছ, আমাদের লজ্জা.....'

সংকোচে ছেলেটি যেন হলঘরের দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে থাকলো। গাছের আড়ালে আমিও হতবাক—এরা তাহলে দুই ভাই, আর ইনি এদের পিতা—সেই দুর্ধর্ষ হাকিমসাহেব।

আবার ভদ্রলোকের কণ্ঠ ভেসে এল, এবারে অনেকটা মার্জিত, অপর ছেলেটি, অর্থাৎ আমাদের দেখা সেই ফার্স্ট বয়টিকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন— 'ছোটু, এভাবে আমাকে না বলে বেরিয়ে এসে তুমি ঠিক করোনি। চলে এসো আমার সঙ্গে এক্ষুণি। ডিভিশনাল কমিশনার সাহেব আর তাঁর স্ত্রী তোমাকে কনগ্রাচুলেট করতে চাইছেন। প্রাইজের বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে এই মুহূর্তে চলো আমার সঙ্গে।' ছেলেটি নীরবে আজ্ঞা পালন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তাকে প্রায় বগলদাবা করে ভিতরে ঢুকবার আগে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে অপরজনকে ভ্রূকুটি করে বললেন—'ছোটুকে নিয়ে আমিই ফিরব, তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই। বেরোবার সময় আমার গাড়ির ত্রিসীমানায় তোমাকে যেন না দেখতে পাই, তাহলে আর রক্ষা রাখব না'—বলে হাতের ছড়িটা বাতাসে আস্ফালন করলেন। তারপর ব্যঙ্গ করে বললেন—'তোমার ছোট ভাইয়ের পাশে তো নয়ই, আমার ড্রাইভারের পাশে বসার যোগ্যতাও তোমার নেই, বুঝেছ। এখন যাও, আউট।' বলতে বলতে ভিতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। হলঘরের বারান্দায় মিলিয়ে গেল তাঁর জুতোর মশমশ আওয়াজ।

পড়ে থাকা ছেলেটি মাথা নিচু করে সন্তর্পণে ইস্কুলের গেটের দিকে পা বাড়ালো, পা যেন তার আর চলতে চায় না। আর এতক্ষণে আমার হতবুদ্ধি ভাবটা কাটলো। খোলা হাওয়া সেবন করার উদ্দেশ্যে বাইরে এসেছিলাম, হঠাৎ মনে হলো এত বদ্ধ আর ভারী হাওয়ায় আমি কখনো দাঁড়াইনি এর আগে, দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো আমার। জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে মাঠে ইতস্তত পায়চারি করতে লাগলাম।

আলো অন্ধকারে স্কুলের মাঠে আমাকে ওভাবে দেখে বোধহয় কারো চোখে পড়ে থাকবে। দেখি, কৌতূহল আর সন্দেহভরে একজন এগিয়ে আসছেন। কাছে আসতেই আমরা পরস্পরকে চিনতে পারলাম। তিনি এই স্কুলেরই একজন সহকারী মাস্টারমশাই, আমাকে দেখে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, বাইরে কেন? চলুন, চলুন, ভিতরে আসুন, ছাত্রদের নাটক দেখবেন না?'

ছেলেটি তখনও স্কুলের বাউন্ডারী পেরিয়ে যায়নি, আমি তাঁর হাত ধরে একরকম টানতে টানতে দ্রুতপদে কয়েক পা এগিয়ে সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম—'মাস্টারমশাই, ওই ছেলেটি কে?'

ভদ্রলোক আমার এই রকম আকস্মিক ব্যবহারে একটু অবাকই হয়ে থাকবেন, খানিক ঠাহর করে তাকিয়ে বললেন—'ওই ছেলেটি? ও তো শেখরের দাদা শংকর, কেন বলুন তো, আপনি

তুমি কেন এসেছ এখানে ?

ওকে চেনেন নাকি ?'

আমি দু-এক কথায় সংক্ষেপে ওঁকে ব্যাপারটা বলতেই উনি ম্লান হাসি হাসলেন। তারপর যা বললেন, তা সত্যিই আশ্চর্যের। শুনলাম, ছেলেটি হাকিমসাহেবেরই বড় ছেলে, ছোট ভাইটির থেকে বছর চারেকের বড়, কিন্তু লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়তে পড়তে কয়েক বছর নষ্ট হয়েছে তার, এখন ভাইয়ের থেকেও এক ক্লাস নিচে পড়ে। এইজন্য ওর বাবা-মায়ের লজ্জার অন্ত নেই, দু-চোখে দেখতে পারেন না ওকে, সব সময় দূর দূর ছাই ছাই। ছেলেটাও যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। 'অথচ জানেন কি'—মাস্টারমশাই আপসোস করে বললেন—'শংকরের মতো সৎ স্বভাবের একটা ছেলে খুঁজে পাওয়া ভার। অমলিন মনে তার এতটুকু ঈর্ষার লেশ কোথাও নেই। এত যে তফাৎ করা হয়, তবু ছোট ভাইটিকে সে খুবই ভালোবাসে, তার সাফল্যে সত্যি করে খুশি হয়, এতই তার উদারতা আর সহনশীলতা—যা দেখে মাঝে মাঝে আমাদেরও শরীর অস্থির করতে থাকে। এছাড়া সাহসী, পরোপকারী, সত্যি কথা বলতে কি, আমরাও মনে মনে ওকে খুবই ভালোবাসি, ওর ভালো হোক তাই চাই, কিন্তু ওর পরীক্ষার রেজাল্টে আমরাও নিরাশ হই। ফাঁকিবাজ, অর্থাৎ যাদের আমরা বলি ব্যাক-বেঞ্চার, সেরকম সে নয়, যথেষ্ট সিরিয়াস, কিন্তু দিনকে দিন যেন কেমন মনমরা হয়ে যাচ্ছে। যা পড়ে তা যেন কোথাও দাগ কাটে না ওর মনে, কোথায় হারিয়ে যায় তার চিন্তাভাবনার খেই, তাই যাচ্ছেতাই ফল করে বসে। দুঃখটা কোথায় জানেন, আমরাও সঠিক ধরতে পারছি না ওর গণ্ডগোলটা কোথায়, গুরুতর কোনো ব্যাঘাত ঘটে থাকলেও সেটা ঠিক কি ধরনের, কেন এরকম একটি ছেলে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদেরও অক্ষমতা তো বটেই।'

গুরুতর গণ্ডগোলটা যে আসলে কোথায় তা মোটামুটি আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম, তবু মনে ছায়ার মতো একটা চিন্তা উঁকি দিল। বললাম—'মাস্টারমশাই, ওর কি কোনোরকম ড্রাগে আসক্ত হবার কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে? ওর মানসিক অবস্থায় সেটা তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

শুনে মাস্টারমশাই হাসলেন, বললেন —'আপনার মতো এই রকম ধারণা যে আমাদেরও মনে একেবারে উদয় হয়নি তা নয়, তবে শংকরের ক্ষেত্রে যুক্তিটা একদম টেকে না। শরীরে ও মনে সে নীরোগ সুস্থসবল ছেলে। কি সাঁতারে, কি ফুটবলে ওর জুড়ি নেই। এর উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন আমাদের স্পোর্টস-এর দিন এখানে এলে। সেদিন ঘটনাটা ঠিক উল্টে যায়, শংকরই মাঠের হিরো, শেখর কেউ নয়। নানারকম ইভেন্টে সে কাপ, মেডেল ও শীল্ড যা জেতে, তা একা বয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। অবশ্য সেদিন কিন্তু হাকিমসাহেব ওকে গাড়ি করে নিতে আসেন না, হয়তো মূর্খ ছেলের পিতৃত্ব স্বীকার করতে তাঁর সেদিনও বাধে, তাই বন্ধু-বান্ধবেরাই হাতে হাতে সেগুলো পৌঁছে দেয়।'

শিক্ষকটি যখন এই কথাগুলো আমাকে বলছিলেন তখন ধীরে ধীরে আমার মনে টুকরো টুকরো কিছু ছবি ভেসে উঠছিল দিন কয়েক আগে এমনি ব্রেকফাস্টের টেবিলে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলুম। একটি ক্লাস নাইনের ছেলে তার বাবা-মাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, তাদের সুখের সংসারে সে বেমানান, কারণ সে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে পারেনি তাই এই গ্লানির বোঝা মাথায় নিয়ে সে স্বেচ্ছায় তাদের সংসার থেকে সরে যেতে চায়। সরে যাবার সহজ উপায় হিসেবে সে ইঁদুরের বিষ যোগাড় করেছিল। সেই খবরটা পড়ে ইস্তক আমার চোখে বারবার ভেসে উঠছিল একসার দ্রুতগামী ইঁদুরের দৌড়ের ছবি। সেই ইঁদুরদের চোখে মোটা কাচের চশমা, পিঠে ভারী বইয়ের বোঝা, একটা মাঠের উপর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে তারা, জিতলেই মেডেল, আর হারলেই সেঁকো বিষ। তাই ছুটতে হবে, জোরে, আরও জোরে। তেমনি করেই আজ এই অন্ধকারে ইস্কুল-মাঠে দাঁড়িয়ে আমার মনটা উড়ে গেল তিরিশটা বছর পার হয়ে, আমার গ্রাম দেশে।

বসিরহাট মহকুমায় টাকীর কাছে ইছামতী নদীর ধারে কেটেছিল আমার ছেলেবেলা। আমরা চার ভাই ও দুই বোন, আমি সবার কনিষ্ঠ। বাবা ছিলেন একজন স্কুলের শিক্ষক, তাঁর সামান্য রোজগারে

এত বড় সংসারটা চালাতে মাকে বেশ বেগ পেতে হতো। তখন ইস্কুল মাস্টারদের সামাজিক সম্মান খুব উঁচু হলেও বেতন ছিল বেশ নগণ্য, আর দেশগাঁয়ে প্রাইভেট টিউশনির প্রথাও তখন চালু হয়নি এখনকার মতো। আমাদের দিন চলে যেতো কায়ক্লেশে, অভাব অনটন লেগেই থাকতো, তবু কারো মনে অশান্তি বা অভিযোগের লেশমাত্র ছিল না। বাবা ছিলেন রাশভারী মানুষ, কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতেন না। আমাদেরও রাখতেন কড়া শাসনে। শুনেছিলাম, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদলে ছিলেন, কারাবরণও করেছেন কয়েকবার, যদিও কখনও তাঁকে নিজমুখে সেসব কথা বলতে শুনিনি কারো কাছে। পরবর্তীকালে স্থানীয় মানুষজনেরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন ও সম্মানপত্রের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করার প্রস্তাব নিয়ে এলে তিনি ঐ দরখাস্তে সই দিতে রাজী হননি। সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সংসারের একটু সুরাহার কথা ভেবে মা বোধহয় এ ব্যাপারে একটু অনুযোগ করেছিলেন, তাতে তিনি বলেন—'দেশমায়ের সেবা করার সুযোগ এ জীবনে পেয়েছিলাম—এই তো যথেষ্ট। কোনো কিছুর প্রত্যাশা করে তা করিনি তো। আর তাছাড়া গ্রাসাচ্ছাদন কোনোমতে চলে যাচ্ছে তো আমাদের, কোথাও কিছু ঠেকে নেই তো। আমার থেকে অনেক বড় দেশব্রতী অনেকেই হয়েছেন, তাঁদের দিক। আমি এ সম্মানের যোগ্য নই।'

সন্ধ্যেবেলা আমাদের নিয়ে নিজে পড়াতে বসতেন বাবা। আশপাশের পাড়া থেকে কখনও কখনও তাঁর ছাত্ররাও পড়া বুঝতে চলে আসতো, আমাদের সঙ্গে বাবাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে যেতো তারাও। সবাইকেই সমান যত্ন নিয়ে শেখাতেন তিনি, এর জন্যে কারো কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক নিতে দেখিনি কখনও। আবার শাসনেও সমান কড়া, কেউ অমনোযোগী হলে বা ফাঁকি দিলে আর রেহাই ছিল না, নির্বিচারে প্রহার জুটতো আমাদের সবারই ভাগ্যে, বিনা পার্থক্যে। এমন একজন মানুষের হাতে বড় হলে সাম্যবাদের পাঠ নতুন করে নিতে হয় না কাউকে, আপ্‌সে ভিতরে ঢুকে যায়। যা হোক, এমনি করেই সুখেদুঃখে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল আমাদের।

আমাদের বড়দাদা সুধাময় লেখাপড়ায় তেমন ভালো ছিল না। যথেষ্ট পরিশ্রম করেও পরীক্ষায় তেমন ভালো ফল করতে পারতো না। এর জন্যে বাবা তাঁকে কৌতুক করে নাম দিয়েছিলেন 'ব্যোমদেব'। মাঝে মাঝে আমাদের ছেড়ে তিনি শুধু তাকে নিয়েই পড়াতে বসতেন, সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতাম, কিন্তু বড়দাকে নাকাল হতে হতো খুবই। গরুর গাড়ির চাকা কাদায় ডুবে গেলে বলদটা যেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়োয়ানের মার খায়, ব্যাকরণ বা অঙ্কের সূত্রে খেই হারিয়ে বড়দাও তেমনি প্রহার খেতো, কিন্তু দু পক্ষেরই কি গোঁ। কেউ ছাড়তো না কাউকে, যতক্ষণ না মা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে দু-পক্ষকে আলাদা করতেন। সে এক পর্ব।

আমাদের মেজোভাই শান্তিময় ছিল এর ঠিক উল্টো। তীক্ষ্ণ মেধা, একবার যা শুনতো বা পড়তো তা আর কখনো ভুলতো না। বেশিক্ষণ বই মুখে করে বসে থাকতেও কেউ তাকে দেখেনি কস্মিনকালে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে লাট্টু-লাটাই-ঘুড়ি আর টো-টো করে দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াতো সে, কিন্তু পরীক্ষায় প্রত্যেকবার ফার্স্ট। কি করে এত অবলীলাক্রমে এই কার্যটি সিদ্ধ করতো সে, তা ভগবানই জানেন। তার বহির্মুখী মন আর লাগাতার ফাঁকিবাজির জন্য বাবা মাঝে মাঝেই বিরক্তি আর উষ্মা প্রকাশ করতেন, কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করেই সে নিজের খেয়ালখুশিমতো চলতো এবং প্রত্যেকবারই পরীক্ষার ফল দিয়ে সবাইকেই তাক লাগিয়ে দিতো। এক কথায় সে ছিল আমাদের হিরো। বড়দাও

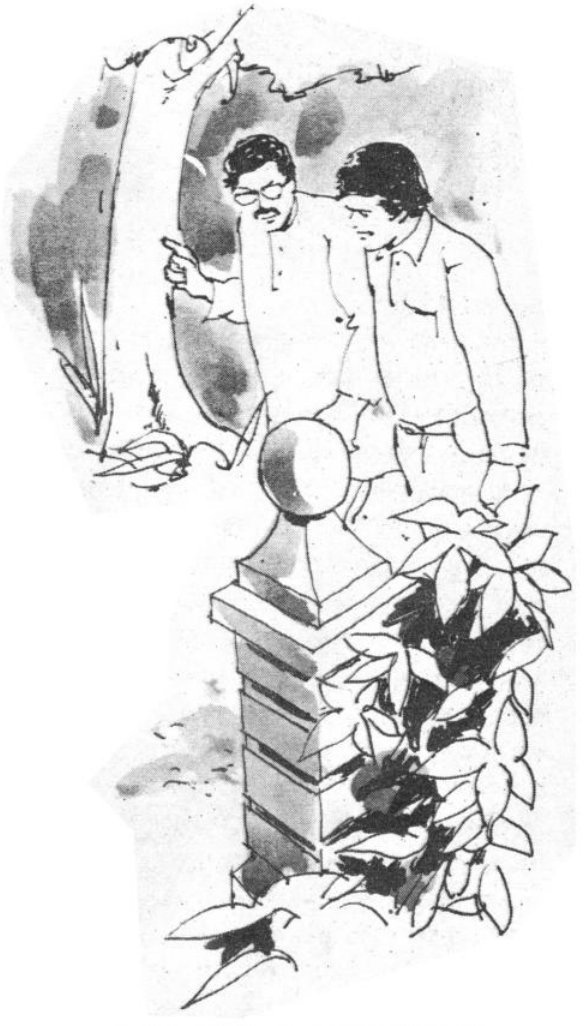

সঠিক ধরতে পারছি না ওর গণ্ডগোলটা কোথায়।

তাকে খুব ভালোবাসতেন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতেও মেজদা যথারীতি জেলায় প্রথম মাসিক কুড়ি টাকা জলপানি পেলো। আমাদের অভাবের সংসারে সেই যুগে কুড়ি টাকার মূল্য প্রচুর, বাড়িতে আনন্দের হাট বসে গেল। একমাত্র বাবাই কিন্তু এতে আহ্লাদিত হয়ে গলে পড়লেন না। খবর শুনে মেজদাকে কেবল বললেন—'প্রথম হয়ে জলপানি পেয়েছ, ভালো কথা। তবে এই সম্মানের যোগ্য বলে নিজেকে প্রমাণ করো, মনে রেখো চালাকি আর ফাঁকি দিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হওয়া যায় না।'

দেখতে দেখতে মেজদার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা সামনে এসে গেল। বড়দা গতবার অকৃতকার্য হয়েছিল, তাই এবার দু-ভাই একসঙ্গে পরীক্ষায় বসবে। বড়দা শেষ রাত্রি থেকে উঠে পড়তে বসে, রাত্রেও অনেকক্ষণ বাতি জ্বেলে পড়ে। তার নিষ্ঠা দেখবার মতো। মেজদা যথাপূর্বম, কখন যে পড়ে বোঝাই যায় না। কেউ সে কথা তুললে মুচকি হেসে বলে—'ওস্তাদের মার শেষ রাতে, মোদ্দা কথা।'

সেবার কলকাতা থেকে একটা যাত্রার দল আমাদের ওখানে গেছে। তাদের হিরোইন খুব নামকরা। সকলের মুখে মুখে তার নাচগানের প্রশংসা। আমরা রক্ষণশীল পরিবেশে মানুষ, এসব থিয়েটারির সাতে-পাঁচে নেই, শুধু বুঝি ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। আমাদের যাত্রায় যাবার প্রশ্নই আসে না, বাবা-মাকেও এসব স্ফূর্তিতে যোগ দিতে দেখিনি জন্মেও। তবু হাটে-মাঠে-ঘাটে-গঞ্জে সেই পালার চর্চা এত বেশি করে চলছিল যে মনে হতে লাগলো এমন একটা জিনিস না দেখলে জীবনই বৃথা। অতিকষ্টে মনের ভাব মনেই চেপে রাখলুম।

মেজদার কিন্তু ব্যাপারই আলাদা। একদিন সন্ধ্যেবেলা আমাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল সে। দুটো টিকিট তার হাতে ধরা। বলল—'চল, একবার পালাটা দেখেই আসি। ঘোষেদের বাড়ির সনাতনের থেকে দুটো টিকিট কিনেছি, তোতে-আমাতে যাবো।'

আমি হতভম্ব। মুখে রা নেই। কোনোমতে আমতা-আমতা করে বললাম—'যাত্রা শুনতে যাবো কি? ও তো বড়দের পালা, বাবা শুনলে আর রক্ষা রাখবেন না। তাছাড়া তুমি পয়সাই বা কোথায় পেলে?'

'আরে অত কথায় তোর দরকার কি? আহাম্মক কোথাকার' —মেজদা খিঁচিয়ে উঠলো—'মাকে বলে যাবো কানুদের বাড়িতে নতুন এডিশনের টেস্ট পেপার এসেছে, তাই থেকে দরকারী জিনিস টুকতে যাচ্ছি, ফিরতে রাত হবে, তাই সঙ্গে তুই। সামনেই পরীক্ষা,এই অকাট্য যুক্তিতে বাবা অবিশ্বাস করতেই পারবেন না'—বলে রহস্যময় হাসি হাসলো।

আপাতদৃষ্টিতে প্লটটা নিশ্ছিদ্র, আমি তাও ইতস্তত করছি, মেজদার মতো সেয়ানা তো নই, নেহাত সাদামাটা, যদি বানিয়ে বলতে না পারি, ভয়ে বুক টিপটিপ করে উঠলো। এমন সময় হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকলো বড়দা, বোধহয় কিছু খুঁজতে। মেজদার হাতে তখনও টিকিট দুটো ধরা, আমাদের ঐরকম রহস্যজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও জিজ্ঞাসু চোখে মেজদার দিকে তাকালো, 'কি হয়েছে রে?' মেজদা প্রথমে বেগতিক দেখে টিকিট দুটো আড়াল করারই চেষ্টা করছিল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, তাই সে মরিয়া হয়ে আমাকে মুখ ভেংচে ধমকে উঠলো—'থাকো পড়ে তুমি, ন্যাকা কোথাকার, আমি একাই যাবো, যত্তো সব।' বলেই ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম করলো।

বড়দা ধীরস্থির মানুষ। আমার দিশাহারা মুখচোখ দেখে মোটামুটি ঘটনাটা আন্দাজ করে নিলো, তাছাড়া মেজোভাইকেও তো সে বিলক্ষণ চেনে। গম্ভীর গলায় সে মেজদাকে পিছু ডাকলো—'শান্ত, তুমি যাত্রাগান শুনতে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি' —মেজদা রুখে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলো—'তাতে হয়েছে কি? তুমি যাবে তো বলো, একটা একস্ট্রা টিকিট আছে।'

'আমার যাবার প্রশ্ন ওঠে না'—বড়দা বললো—'তোমাকেও বলবো, না যেতে। আর কয়েকটা দিন বাদেই এত বড় পরীক্ষা আসছে, তাতে তোমার আরও মনোযোগ দিয়ে তৈরি হওয়া উচিত, এটা যাত্রা-থিয়েটার দেখে বেড়ানোর সময় নয়।'

'থাক, থাক'—মেজদার গলায় ঝাঁঝ ফুটে বেরোল—'আমার পরীক্ষার পড়া আমি ভালো বুঝবো, তোমাকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও, যাতে অন্তত এবার পাশ হতে পারো।'

'আমার সঙ্গে তোমার তুলনা করছ কেন শান্ত?' বড়দার কণ্ঠস্বর বেশ আহত—'আমার চেষ্টার ফল যা হবার তা হবে। কিন্তু তুমি স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে, যাঁরা তা দিয়েছেন তাঁদের সকলেরই তোমার উপরে কত প্রত্যাশা আছে, শুধু আমাদের পরিবার নয়, এই স্কুলের, এই জেলার, যাঁদের আশীর্বাদের দান তুমি গ্রহণ করেছ, তোমার উচিত আরও পরিশ্রম করে তাঁদের সকলের মুখোজ্জ্বল করা, তুমি যে আমাদের সকলের গর্ব শান্ত, মা-বাবার আশা-ভরসা।'

'আমার স্কলারশিপ কারো দান নয়, আমি রীতিমতো ফার্স্ট হয়ে তা রোজগার করেছি, তা দিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারি, তাতে কার কি?' মেজদার তেরিয়া জবাব।

'না ভাই, এটা তুমি ঠিক বললে না'—বড়দা স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলো—'এটা গরীব দেশ, জলপানির পয়সা একমাত্র লেখাপড়া—উন্নতির জন্যই ব্যবহার করা উচিত, তা দিয়ে স্ফূর্তি-আমোদ লোটা কোনো ছাত্রেরই কর্তব্য নয়, এটাই আমার ধারণা।'

'বাঃ, খাসা বলেছ।' মেজদার গলায় বিদ্রূপ ঝরে পড়ল,

'তা তোমার এই ধারণাগুলো গুছিয়ে পরীক্ষার খাতায় লেখো না কেন, দেখো হয়তো তাতে নিদেনপক্ষে পাশ নম্বরটা উঠে যেতে পারে'....মেজদার মুখের কথা এখানেই অসমাপ্ত অবস্থায় তার মুখে ঝুলে রইলো, কারণ সভয়ে দেখলাম দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং বাবা, দুচোখে তাঁর জ্বলন্ত ভর্ৎসনা। এর আগে বা পরে আমার কখনো সেভাবে মনে পড়ে না তিনি মেজদার গায়ে হাত তুলেছেন, কিন্তু সেদিন এর তীব্র ব্যতিক্রম হলো। চুলের মুঠি ধরে সে কি বেদম প্রহার, তাঁর সবল হাতের শাসনে হাউমাউ করে আর্তনাদ করতে লাগলো মেজদা, বরং বড়দাই দুহাত বাড়িয়ে ওকে আগলাবার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু জগন্ময় মাস্টারের গোরা-ঠেঙানো হাতের মোকাবিলা করে কার সাধ্য। মারের চোটে মেজদা বড়দার পায়ের কাছে চিৎপাত হয়ে পড়লো। দুচোখে তার আতঙ্কের চেয়েও অবিশ্বাস এবং বিস্ময় ফুটে উঠলো বেশি করে, যেন বড়দার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি যে এইরকম মারাত্মক পরিণতি হতে পারে সেটা তার কল্পনারও অগম্য ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে তার দিকে তর্জনী তুলে বাবা গর্জন করে বললেন—'সাবধান, তুমি জেলার ফার্স্ট বয় হতে পারো, কিন্তু ভুলে যেও না ও তোমার বড়ো দাদা।'

তারপরে বহু বছর পার হয়ে গেছে। বাবা সেদিন যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছিলেন তা গেঁথে গেছে আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। বড়দা লেখাপড়ায় বেশিদূর এগোতে পারেননি, সেই তুলনায় আমরা বাকি তিন ভাই জীবনে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছি, কিন্তু আমাদের আর কখনো মনে করিয়ে দিতে হয়নি, আমাদের মাথার উপরে কার স্থান। বড়দা দেশের ঘরেই একটা র‍্যাশন অফিসের সাধারণ কর্মচারী হয়ে জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ নজরদারিতে সেই এলাকায় ভেজালের কারবার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল, লোকের মুখে মুখে ওঁর সুধাময় নামটা উল্টে গিয়ে হয়ে গিয়েছিল 'সাধুময়'। আজ মেজদা শান্তিময় একজন প্রতিথযশা থোরাসিক সার্জেন, সেজদা পরমাণু-বিজ্ঞানী, সে আমেরিকায় থাকে আর আমি একজন পদস্থ ইঞ্জিনীয়ার। মৃত্যুশয্যায় বাবা আমাদের দেখিয়ে বড়দাকে বলে গিয়েছিলেন—'এরা রইলো, তুমি দেখো।' বড়দা সারাজীবন অক্ষরে অক্ষরে সে আজ্ঞা পালন করেছেন। একে একে প্রতিষ্ঠা এসেছে আমাদের জীবনে। এসেছে বিবিধ সাফল্য, দেশে-বিদেশে আমন্ত্রণ। প্রতিবারই বড়দার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, সেগুলো যেন তাঁরই সফলতা। সগর্বে আমাদের বুকে টেনে নিয়ে বলেছেন—'আহা, আজ বাবা যদি থাকতেন, কত আনন্দই না তাঁর হতো। আমি তো তাঁর কোনো আশা পূর্ণ করতে পারিনি।'

সেই বড়দা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে আমাদের উন্নতি কামনা করে চলে গেছেন। আজকে আবার তাঁর মুখটা তীব্রভাবে আমার মনে ভেসে উঠলো,

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং বাবা।

ছোট ভাইয়ের সাফল্যে ছুটে আসা ওই কিশোর। বড় ভাইটির নিষ্পাপ মুখে আমি আমার হারিয়ে যাওয়া বড়দাকে নতুন করে দেখতে পেলাম, স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে। আমার সামনে দাঁড়ানো সেই সহকারী শিক্ষকমশাই-এর ডাকে আমার সম্বিত ফিরলো। তিনি আমাকে আবার তাড়া দিলেন ভিতরে গিয়ে বসার জন্য। ড্রপসিন উঠবার সময় হয়ে গিয়েছে। আমি অধীরভাবে তাঁর হাত দুটি ধরে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বললাম—'মাস্টারমশাই, এক্ষুণি চলুন, মাইকে একটা জরুরী ঘোষণা করতে হবে। আমার প্রয়াত বড়দা সুধাময়ের নামে আমি এই স্কুলে একটা পুরস্কার দিতে চাই, যার সাম্মানিক মূল্য হবে আজ সন্ধ্যের সব পুরস্কারের থেকে মহার্ঘ, একটি স্বর্ণপদক—এর আর্থিক দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। এখন থেকে প্রতি বছর এটি দেওয়া হবে—সব থেকে মহৎ ও সৎ-স্বভাবের জন্য। এ বছর থেকেই এটি চালু হলো, প্রথম বার এই পদকটি কে পাবে বলুন তো?'

বিনা দ্বিধায় শিক্ষকমশাই বললেন—'কেন—শঙ্কর। আমার সঙ্গে প্রধানশিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকেরা অবশ্যই একমত হবেন।'

ছবিঃ ধ্রুব রায়

ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেল এক্স (ভাদ্র সংখ্যার পর)

মহামান্য সার্জেন্টের জন্যে টাটকা মাসরুম নিয়ে যাচ্ছি। উনি খেতে চেয়েছিলেন.....
যাও যাও! ওকে লনে পাবে, ব্রেকফাস্ট সারছে। ব্যাটা ওখানে বসে খাচ্ছে আর আমি ভুখা মরছি। কদিন ধরে পেটভরে খেতেই পাচ্ছি না!

ছুটে আয়, ছুটে আয়.....তুই কি চাস আমি না খেয়ে মরি?

করপোরাল বৃটিশ কুত্তাটাকে আনো। ব্যাটার খালি পেট। আমায় খেতে দেখলে নিশ্চয়ই খিদের চোটে ওর মুখে কথা ফুটবে।
এক্ষুণি যাচ্ছি সার্জেন্ট!

উঃ, লোকটা কি খেতে পারে! ঐ তো কনরাড আসছে!

কাল রাত্তিরে কেন তুমি এই ছোট্ট শহরে নেমেছো?
ভেবেছিলাম, নিচে নেমে কিছু ফুল তুলবো।

আমায় বোকা বানাবার চেষ্টা? দেখাচ্ছি তোমার মজা!
সসেজটা আমায় না দেখিয়ে নিজে খাও বন্ধু। তোমার যে বড্ড খিদে।
(চলবে)

সব্যসাচী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আধ ঘন্টাও কাটেনি তারপর। রাত্রিটা শীটার (চিতার) ভাল যায়নি। সন্ধ্যা রাতে যাহোক একটু খাবার মিলেছিল। একটা বানরের বাচ্চা দৈবাৎ গাছের ডাল থেকে পড়ে গিয়েছিল গাছতলায়। শীটা তখন ওৎ পেতে ছিল ঐ গাছতলাতেই। বানরশিশুর আর্তনাদে সচকিত হয়ে তার মা এবং জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিচে এসে জমবার আগেই শীটা এক লাফে কবলিত করেছিল বাচ্চাটাকে। সারা দিনের উপোসের পরে মন্দ লাগেনি সেই কোমল মাংসটুকু। কিন্তু পরিমাণের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সেটুকু বানরমাংস তো নস্যি, শীটার প্রয়োজনের অনুপাতে। ক্ষুধার আগুনে তা কাজ করেছে ঘৃতাহুতির মতো।

তাই সে সারা অরণ্য তোলপাড় করে বেড়িয়েছে সারা রাত্রি শিকারের সন্ধানে। কিন্তু পোড়া কপালে কিছুই তার জোটেনি আর। হরিণ? একখানা ঠ্যাংও নয় হরিণের। শূকর ? বেঁড়ে লেজের একগাছা চুলও নয় শূকরের। শীটার পড়তা খারাপ, যারপরনাই খারাপ। সে মরিয়া। রাত ভোর হয়ে গেল। শিকারী পশুরা যে যার ডেরায় ঢুকে পড়ার তালে আছে। গাছের কোটরে, পাহাড়ের গুহায় বা সুড়ঙ্গে, নিদেন পক্ষে মাটির তলার ঘোরানো প্যাঁচানো গর্তে।

সবাই যাচ্ছে ডেরায়। পেট ভরে থাকুক বা না থাকুক গত রাত্রির চরায়। একে তো বোঙ্গার হুকুমই আছে, জানোয়ারেরা বিষয়কর্ম (শিকার) করবে রাত্রিবেলায়, আর ঘুম দেবে সারা দিনমান। তার উপরে ইদানীং অসময়ের শিকার বিপজ্জনকও হয়ে দাঁড়িয়েছে এ অরণ্যে। আগে এদিকে জানোয়ারদেরই একছত্র রাজত্ব ছিল। মানুষ এখানে ঢুকতই না ন্যুমা-শীটাদের ভয়ে। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন বনের ওধার থেকে জার্মান আসছে ঘোড়ায় চড়ে। এধার থেকে ইংরেজ। তারা পায়ে হেঁটেই যাচ্ছে বটে, কিন্তু যাচ্ছে দলবদ্ধ হয়ে। তাদের সমুখে এগুবে কে? আগে আগে ন্যুমা-শীটারা জানত যে মানুষের মতো এমন দুর্বল অসহায় জীব আর নেই। তাদের না আছে নখ না আছে দাঁত। এমনকি, দু'খানা ভোঁতা শিংও বোঙ্গা দেননি তাদের। ন্যুমা-শীটারা খেয়ে বাঁচবে বলেই পরম কারুণিক বোঙ্গা এই রকম নিরস্ত্র নিরুপায় করে ভবের অরণ্যে ছেড়ে দিয়েছেন তাদের। কিন্তু এ গেল আগের কথা। যুগটা পালটে গিয়েছে হালফিল। শিং তো চুলোয় যাক, শাণিত নখর বা করালদংষ্ট্রা নিয়েও হিংস্র জন্তুরা আত্মরক্ষা

করতে পারছে না বন্দুকধারী মানুষের হামলা থেকে।

তাজ্জব-কি-তাজ্জব! কোথায় আছে শীটা, আর কোথায় আছে মানুষ। মাঝখানে এক দৌড়ের ফারাক। দৌড় দেওয়ার তবু দরকারই হয় না মানুষগুলোর। ঐ ফারাকে দাঁড়িয়েই ওদের বাঁকানো তোবড়ানো অস্তোরটা থেকে একটা আওয়াজ করে। আর এধারে, এক দৌড়ের পথ পেরিয়ে উড়ে আসে একটা শক্ত ঢ্যালা। বিঁধে যায় ন্যুমা-শীটার গায়ে গভীর হয়ে।

হ্যাঁ, দিনেরবেলার শিকার যে জানোয়ারদের পক্ষে নিষেধ করে দিয়েছিলেন বোঙ্গা, সে বোধ হয়, বর্তমানের এই সঙ্গীন পরিস্থিতি তিনি আগে থাকতেই দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন বলে। নিষেধ করেছিলেন জন্তুদের ভালোর জন্যেই। কিন্তু সব জেনেশুনেও সে নিষেধ আর শীটা মানতে পারছে কই? পেটে ক্ষিধে থাকলে কি ঘুম হয়? হয় না যে, তা বোঙ্গা বিলক্ষণ জানেন। বোঙ্গাও জানেন, জানে এই অভাগা শীটাও। শীটা জানে বলেই ডেরায় ফেরার নামও করছে না। বোঙ্গার নিষেধ অমান্য করা হচ্ছে, তা জেনেও। ঘুরছে, হতাশ হয়েও আশা ছাড়েনি। রোদ উঠেছে ঝকমকিয়ে। তবু সে ঘুরপাক খাচ্ছে, কিছু একটা খাদ্য জন্তু দৈবাৎই তার সমুখে পড়ে যাবে, এই আশায়।

ঘুরতে ঘুরতে সে যেন পাথর বনে গেল হঠাৎ। অনড় একদম। গাছপালারও পাতা নড়ে, নদীর জলও স্রোতে নড়ে, এমন যে মাটি-মা, তিনিও ভুঁইচালের সময় বিলক্ষণ নড়াচড়া করেন। নড়ে সবাই। কিন্তু শীটা মোটেই নড়ছে না এই মুহূর্তে। কারণ? আছে বই কি কারণ। এমন একটা অপ্রত্যাশিত, চমকপ্রদ, মনোমদ দৃশ্য সে দেখতে পেয়েছে হঠাৎ যে চারখানা পায়ের একখানাও এক চুল নাড়াবার সামর্থ্য আর তার নেই।

দৃশ্যটা এই যে জন্তু-জানোয়ারের চলাচলের এই যে শুঁড়ি পথটা, এইটের উপরেই পড়ে আছে একটা নধর গোমাঙ্গানি। মানুষ!

বোঙ্গার অন্তরে এতখানি করুণা ছিল এই অভাগা শীটার উপরে, তা তিনি আগে তাকে জানতে দেননি কেন? মিছেই সে যুগপৎ দু দুটো আগুনে জ্বলে মরেছে এতক্ষণ। এদিকে ক্ষিধের আগুন পেটে, ওদিকে নৈরাশ্যের আগুন মাথায়।

মানুষটা মরেছে? না, মরার চেষ্টায় আছে? মরে থাকলে তো কথাই নেই, না মরে থাকলেও শীটা তাকে মরার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। তবে কথা এই, মানুষ জাতিটাই খল। মরার ভান করে ও হয়তো কোনো শয়তানী চাল চালিয়ে দেবার

পড়ে আছে নধর গোমাঙ্গানি

ফন্দি করছে শুয়ে শুয়ে। শীটা কোনো ফাঁদে পড়ার পাত্র নয়। খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবে সে। ধীরে ধীরে, চোখ কান সজাগ রেখে সে এগুলো।

লাফ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে শীটা। এক্ষুনি দিল বলে। কিন্তু এ আবার কী? শীটার পায়ের কাছে, মাটির ভিতর থেকে একটা গুরুগুরু আওয়াজ উঠছে নাকি? একটা চাপা গর্জন? কোন শক্তিমানের শাসানি? এ আবার কী হলো?

আর কিছু হয়নি, ন্যুমা এসেছে একটা।

ঘোড়ার মাংস খেয়ে খেয়ে পেট ভরে গিয়েছে। এখন বিশ্রাম নেবেন ন্যুমা মহারাজ। আগের রাতে পরিখাযুদ্ধে এক রথে পৃথিবী জয় করেছেন তিনি। খাওয়াও সেই থেকে দফায় দফায় চলছে। একটা ঘোড়া ভোজন তার শেষ হলো। উদর পূর্ণ থাকলে প্রত্যেকেরই অন্তরে বিশ্ব-চরাচরের উপরে বাৎসল্য জাগে একটা। ন্যুমারও এখন সেই অবস্থা। তিনি সবাইকেই বাৎসল্য বিতরণে প্রস্তুত। জাতিগত হিসাবেই শীটাগুলোকে তিনি অপছন্দ করেন। ওরা হ্যাংলা, ওরা নির্বিকারে যা-তা খায়। জন্তুসমাজেও ওরা অহেতুক নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত। অনেক কারণেই পশুরাজের কাছে ওরা অবাঞ্ছিত।

তবু এই ভোরের হাওয়ায় একটা শীটার গায়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যখন, অনুমান করা যায় যে রাতে ও শিকার ধরতে পারেনি। পারত যদি, এতক্ষণ ডেরায় গিয়ে ঘুমুতো। তা রাতে যদি ও উপোস দিয়ে থাকে, আর এখন যদি ও শিকারের সন্ধান পেয়ে থাকে, তাহলে পশুরাজের প্রসন্ন আশীর্বাদ রইল, শিকার ধরে, পেটটা পূর্ণ করে, আরামসে ঘুমোও গিয়ে ডেরায়।

হঠাৎ সমুখেই পথের উপরে ন্যুমা দেখতে পেলো টারজানের অচেতন দেহ। এবার আর টারজানকে চিনতে তার কষ্ট হয়নি, কারণ এই তো এইমাত্র টারজানের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলাপ হয়েছিল, অশ্বমস্তক চর্বণ করতে করতে।

টারজানকে চিনেছে হারানিধি। আর নাকেও পেয়েছে শীটার গন্ধ। এ অবস্থায় টারজান যদি শায়িত, সম্ভবত অচেতন অবস্থায় না থাকত তাহলে হয়তো হারানিধি উদাসীন দর্শকের ভূমিকা নিতেও পারত। কিন্তু এক্ষেত্রে বন্ধু যেখানে অসহায় সেখানে হারানিধির কর্তব্য কী?

একটি সমুচ্চ গর্জন, একটি সুদীর্ঘ লম্ফ। পরের মুহূর্তেই টারজানের অচেতন দেহের দুই পাশে চার পা প্রোথিত করে হারানিধি লৌহ প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে গেল শীটাকে রুখতে।

আর শীটা? ক্ষুধা যতই প্রবল হোক, ন্যুমার সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা করার কথা সে ভাবতেও পারে না। লেজ গুটিয়ে সে পিছু হটল।

টারজানের জ্ঞান ফিরল প্রায় আধঘণ্টা পরে। চোখ মেলেই দেখল তার ডাইনে বাঁয়ে চারখানা পা, শালের গুঁড়ির মতো মোটা। আর তার মাথায় মুখে ঘসঘস করে জিভ ঘষছে এক বিরাট জীব, যাকে চিনতে ক্ষণমাত্রও দেরি হলো না টারজানের। এ নিশ্চয়ই ন্যুমা হারানিধি।

ব্যাপারখানা কী হয়েছিল? মাথায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিসের যন্ত্রণা? ভাবতে গেলেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কেবল বোজা চোখের সামনে ভেসে উঠছে একখানা মুখ। কার? এ মুখ কার? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, জার্মান গুপ্তচর মিচেলস-এর।

কোথায় যেন তার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল টারজান, তাই না? হঠাৎ মাথায় চোট লাগল। তারপর আর কিছু তার মনে নেই। জ্ঞান হতেই দেখল, তাকে আগলে রয়েছে ন্যুমা-বন্ধু হারানিধি।

'ন্যুমা, সর ভাই', আদর করে বলল টারজান, হারানিধির গলায় হাত বুলোতে বুলোতে। হারানিধি তাকে ছেড়ে সরে দাঁড়ালো একপাশে, কিন্তু তার দুচোখে তখনও একটা জিজ্ঞাসা। 'পারবে তো উঠতে? খুব ফাঁড়া গিয়েছে কিন্তু। শীটার পেটেই যেতে হতো, আমার আসতে আর একটু দেরি হলে।'

টারজান শীটার বৃত্তান্ত জানে না, ন্যুমার ভাষা থেকেও বুঝতে পারল না ঠিক। তবে না বুঝুক ভাষা, অনুমান করে নিল যে খুব একটা নিদারুণ বিপদই ঘটেছিল তার, তা নইলে ন্যুমা তাকে আগলে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকত না। 'ধন্যবাদ হারানিধি', বলে সে উঠে দাঁড়ালো আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, গুরুতর ঘটনাই একটা কিছু ঘটেছিল নিশ্চয়ই। তা নইলে এমন ব্যথা কেন মাথার পিছনে?

ঐ মিচেলস! ঐ পাষণ্ডই একটা কিছু করে থাকবে। গুপ্তচর বই অন্য কিছু তো নয়! ওরা বিবেকহীনই হয়।

ন্যুমা চলে যাচ্ছে। নীরব ভাষায় যা বলছে, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই টারজানের। ও বলছে, 'বিদায় বন্ধু! আবার আসব।' 'এস বন্ধু', হাত তুলে বিদায় সম্ভাষণ জানালো টারজানও।

চলে গিয়েছে ন্যুমা। টারজান ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু করল। ঠিক! শুঁড়িপথটা চিনতে পারা যাচ্ছে। ঐদিক থেকে হেঁটে আসছিল ওরা দুজনে। পাশাপাশি হেঁটে। টারজান অন্যমনস্ক ছিল। মিচেলস-এর উপস্থিতির কথা মনেই ছিল না।

কেন ছিল না? টারজান তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার ভুলে যাওয়ার মতো মানুষ নয়! একটা গুপ্তচরকে সঙ্গে নিয়ে সে অজগর অরণ্যের পথহীন পথে বিচরণ করছে, অথচ সে ভুলে গেল সেই গুপ্তচরটার অস্তিত্বের কথাই? কেমন করে তা সম্ভব হলো? টারজানের প্রকৃতির সঙ্গে এই মারাত্মক স্মৃতি-ভ্রংশ তো খাপ খায় না!

কী কারণ থেকে থাকতে পারে এর? কী সে অতিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যার চিন্তায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল টারজান?

(চলবে)

ছবিঃ নারায়ণ দেবনাথ

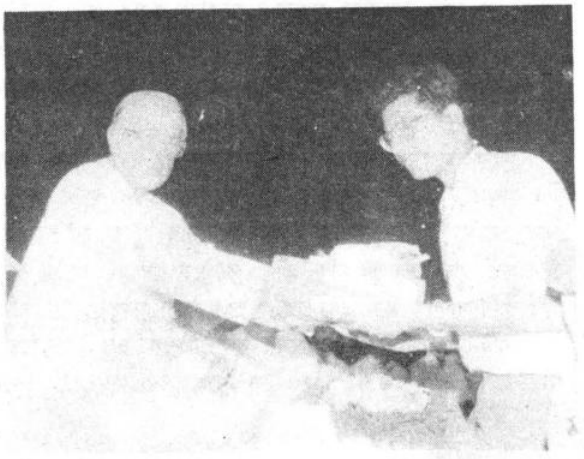

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে প্রথম স্থানাধিকারীর পুরস্কার নিচ্ছেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র অঞ্জন রায়।

ছবিঃ সমীরকুমার ঘোষ

পুরস্কার নিচ্ছেন দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সেন্ট জেভিয়ার্স কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্র সৌম্য ঘোষ।

ছবিঃ অরিজিৎ ভট্টাচার্য

সুবোধচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার

২৫ জুন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ১৯৯২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানান। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। দেব সাহিত্য কুটিরের প্রয়াত কর্ণধার সুবোধচন্দ্র মজুমদারের ইচ্ছানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে বিশেষ 'সুবোধচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে এই পুরস্কার ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আনন্দ ও উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে।

এই বছর থেকেই পর্ষদ দৃষ্টিহীন প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যম। এ বছর প্রথম পুরস্কারের সম্মান অর্জন করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমীর ছাত্র বিপ্লব ঘোষ ও ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্রী রূপা ভদ্র। এ ছাড়া তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রথম স্থান অর্জন করার ভিত্তিতে পুরস্কৃত হন।

পুরস্কৃত হচ্ছেন তৃতীয় স্থানাধিকারী সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্রী অনন্যা সেনগুপ্ত।

ছবিঃ অরিজিৎ ভট্টাচার্য

পুরস্কার নেবার পর নমস্কার জানাচ্ছেন রূপা ভদ্র।

ছবিঃ সমীরকুমার ঘোষ

গোয়েন্দা হলো জব্দ

রণেন বসু

না, সোনার কপালে আর সে সুযোগ আসবে না। কত দিন ধরে সে আশায় আশায় দিন গুনছে কিন্তু দিন গোনাই সার। শেষ পর্যন্ত সে বেশ হতাশই হয়ে পড়েছে। দিনের পর দিন রাস্তার ধারে দোতলার এই জানালাটার ধারে বসে থাকে। দেখতে দেখতে গরমের ছুটি কেটে গেল, আর চার দিন পরেই স্কুল খুলবে। তখন তাকে সারা দুপুর স্কুলেই কাটাতে হবে। দুপুরটাই মূল্যবান সময়, আর সেই সময়টাতেই সে এখানে বসতে পারবে না। এবার সত্যিই তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়।

কত শত চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই হামেশাই ঘটছে। কাগজ খুললেই প্রায় দেখতে পাওয়া যায় ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবর। অ্যাম্বাসাডারে চড়ে তারা আসছে, দুমদাম বোমা ছুড়ে বীরদর্পে তারা ফিরে যাচ্ছে সঙ্গে নিয়ে বস্তা বস্তা টাকা।

এই তো আজকের কাগজেই আছে ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবর। অথচ ডাকাতগুলোর আক্কেল দেখ। সোনাদের বাড়ির সামনেই অত বড় ব্যাঙ্ক। সেদিকে তাদের নজরই নেই! নিউ আলিপুরের এদিকটা ফাঁকা আর নিরিবিলি। নিঃশব্দে তারা কাজ হাসিল করে ফিরে যেতে পারে। বোমা ছোড়ার কোনো দরকারই লাগবে না। রাস্তায় লোক কোথায়? এই জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরের কাঠফাটা রোদে কে আর বেরোবে রাস্তায়? ডাকাতি করার এমন সুযোগ তারা নিচ্ছে না! সোনা মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে ভাবে, তবে কি ডাকাতরা তার খবর জেনে গেছে, আর তাতেই তারা এদিকে আসতে সাহস পাচ্ছে না?

এদিকে তার ডাকাত ধরার সব আয়োজনই সারা। এখন শুধু দিন গোনা, কবে ডাকাতেরা এই ব্যাঙ্কের ওপর চড়াও হবে। আর চড়াও হলেই সে তার ডাকাত ধরার সমস্ত কৌশল ও কেরামতি দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। অরণ্যদেব, রিপ কার্বি, যাদুকর ম্যানড্রেক থেকে শুরু করে ফেলুদা, গোগোল সব কাহিনীই তার পড়া। তাদের কলাকৌশল তার নখদর্পণে। সাঁতার, জুডো ক্যারাটে কুংফুও সে শিখছে নিয়মিতভাবে। কিন্তু সবই তার বৃথা হতে চলেছে শুধু ডাকাতের অভাবে। তারা সারা কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে অথচ এদিকে তারা ভুলেও আসছে না।

দিনের পর দিন সোনা নিঃশব্দে নজর রেখে চলেছে ব্যাঙ্কটার ওপর। ওদের বাড়ির উল্টোদিকেই দোতলার উপর ব্যাঙ্কটা, ঘেরা সিঁড়িটা রাস্তা থেকেই সোজা দোতলায় উঠে গেছে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, আজ পর্যন্ত কোনো সন্দেহজনক ঘটনাই তার চোখে পড়লো না। কী শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাটে দিনগুলো, একের পর এক কেটে যাচ্ছে। ক্রমশই সে অধৈর্য হয়ে পড়ছে।

সামনের দেওয়ালে সুন্দর করে সাজানো আছে শক্তিমানদের ছবি—অরণ্যদেব, ম্যানড্রেক, বাহাদুর ও ফেলুদার। সবার শেষে নিজেরও একটা ফটো টাঙানো রয়েছে। ওদের পাশে নিজের ফটো লাগালেও ওদের সে গুরুর মতোই শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

অবশ্য এজন্য বাড়িতে হাসিঠাট্টা কম হয় না। দাদা তাকে গোয়েন্দাপ্রবর বলে ক্ষ্যাপায়। তবে হ্যাঁ, ছোটকা তাকে সব সময়ই মদত দেয়। বছর পাঁচেক হলো ছোটকা ক্যালকাটা পুলিশের চাকরি নিয়েছে আর এরই মধ্যে একদল ডাকাত ধরে নামও করেছে বেশ। তাই ছোটকার সমর্থনের মূল্য সোনার কাছে অনেক। সেজন্যই সে অন্যের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পরোয়া করে না।

আজ যথারীতি সে জানালার ধারে বসে ফেলুদার 'দার্জিলিং জমজমাট' বইটা একবার ঝালিয়ে নিচ্ছিল। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কের ওপরেও নজর রেখেছে সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কালো অ্যাম্বাসাডার এসে ব্যাঙ্কের সামনেই দাঁড়ায়। হয়তো ঘটনাটা সামান্যই, কিন্তু সোনার কাছে কোনো ঘটনাই সামান্য নয়। এইটাই তার গোয়েন্দা জীবনের প্রথম শিক্ষা। বইটা মুখের সামনে ধরে সে নজর করতে থাকে।

যা ভেবেছিল, ঠিক তাই, গাড়ির ভিতর থেকে তিনজন নেমে

প্রথমে রাস্তার ওপর থেকে দোতলায় ব্যাঙ্কটা ভাল করে দেখে নেয়। তার পরেই নিজেদের মধ্যে কী সব কথাবার্তা বলে, তা এতদূর থেকে শোনা সম্ভব নয়। পরমুহূর্তেই তারা সিঁড়ি বেয়ে সোজা দোতলায় উঠে যায়। ওদের একজনের হাতে বেশ বড় একটা অ্যাটাচি কেস আর অন্য দু'জনের ডানহাত দুটো প্যান্টের পকেটে ঢোকানো।

মুহূর্তে তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরন খেলে যায়। সে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে, ব্যাঙ্কের দোতলা থেকে কোনো গোলমালের শব্দ শোনা যায় কিনা। কিন্তু কোনো গোলমালের শব্দই সে শুনতে পেলো না। কেউ দোতলা থেকে নিচে নামছেও না, ওপরেও উঠছে না। কেউ যে নিচে নামবে না তা তো সে জানেই, ডাকাতেরা কি কাউকে নিচে নামতে দেয়!

সে আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। তার গুলতিটা হাতে নিয়ে, বেশ কিছু কাচের মার্বেল পকেটে ভরে নেয়। তার পরেই ছুটে নিচে নেমে প্রথমেই ছোটকাকে ফোন করে। ভাগ্যক্রমে ছোটকাই ফোন ধরে। ছোটকা কিছু বলার আগে সে চিৎকার করে ওঠে, 'ছোটকা শিগ্রী এসো, ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে।' বলেই দুম করে রিসিভারটা নামিয়ে ছুটে রাস্তায় নেমে আসে। তার পক্ষে একমুহূর্ত সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। যে কোনো মুহূর্তে ডাকাতেরা কাজ হাসিল করে চলে যেতে পারে।

বাইরে এসে সে নিশ্চিন্ত হয়, গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। সে এপারের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গাড়িটার ওপরে নজর রাখে। আর তখনই দেখতে পায়, সামনের সিটে ড্রাইভার বসে। সে বুঝতে পারে ড্রাইভারও আছে প্রস্তুত হয়ে, ওরা নিচে নামলেই গাড়ি ছেড়ে দেবে।

সে ড্রাইভারের দিকে নজর রাখতে থাকে। ছোটকা না আসা পর্যন্ত রাখতেই হবে। হঠাৎ লোকটা গাড়ির সামনের খোপ থেকে কী একটা বার করে প্যান্টের পকেটে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ির গেটে উঁকি দিয়ে ব্যাঙ্কের দোতলার দিকে তাকায়। পরে এদিক ওদিক তাকিয়ে সোজা চলে যায় ব্যাঙ্কের পাশেই গলির মুখে পানের দোকানে। দোকানদারকে কী যেন বলে, দোকানে টাঙানো আয়নায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের মুখ দেখতে থাকে। সোনার সন্দেহ থাকে না, লোকটা আয়নার ভিতর দিয়ে সব কিছু লক্ষ্য রাখছে। হয়তো পানওয়ালাটা ওদেরই চর।

এই সুযোগটা সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। ডাকাতদলকে সে একা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না। তবুও যতক্ষণ ছোটকা না আসছে ততক্ষণ এদের আটকে রাখতেই হবে। আর আটকে রাখার এই সুযোগ।

সে পকেট থেকে একটা কাচের মার্বেল বার করে রাস্তার এপার থেকে গাড়িটার দিকে গড়িয়ে দেয়। হাত থেকে পড়ে গেছে ভান করে সে মার্বেলটা ধরার জন্য ছুটে যায় গাড়ির কাছে। সেটা ততক্ষণে গাড়ির তলায় গড়িয়ে গেছে।

অদূরে পানের দোকানে দাঁড়ানো ড্রাইভারের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতেই সে পিছনের চাকার কাছে বসে পড়ে।

ড্রাইভার মুখে পান গুঁজে মাথায় চিরুনি চালাচ্ছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। সে ততক্ষণে পিছনের চাকার হাওয়া-নলের মুখ খুলে দিয়েছে। বেশ জোর শব্দ তুলেই হাওয়া বেরিয়ে আসে, কিন্তু পাশ দিয়ে ভারি একটা লরি যাওয়ার জন্য দূরে দাঁড়ানো ড্রাইভার সে শব্দ শুনতে পায় না।

সোনা নিরীহ ছেলের মতো মার্বেলটা কুড়িয়ে নিয়ে এপারে চলে এসে নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দুটো তার রাস্তার এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত ঘুরতে থাকে। পুলিশের ভ্যান বা জীপের টিকিও তার চোখে পড়ে না। সে ব্যাঙ্কের সিঁড়ির ভিতরটা উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু এপার থেকে কিছুই দেখা যায় না। গরমের দুপুর, রাস্তার দিকে কাচের পাল্লাগুলো বন্ধ।

ডাকাতগুলো নামছে না কেন? এতক্ষণ তারা উপরে করছেই বা কী? টাকা গুনছে নাকি? আজকাল ডাকাতেরা গুনে গুনে টাকা নেয় নাকি! সে বেশ অধৈর্য হয়ে পড়ে।

ছোটকারই বা কী আক্কেল! ডাকাতেরা গুনে গুনে ব্যাঙ্কের টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে, আর ওনার দেখা নেই! এই জন্যই পুলিশের দ্বারা কোনো কাজ হয় না। বিরক্তির সঙ্গে সে গাড়ির

মুখোপাধ্যায় • মান্না • দত্ত

উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান

(হায়ার সেকেণ্ডারী • জয়েণ্ট এণ্ট্রান্স • সর্বভারতীয় বায়োলজী পরীক্ষার্থীদের জন্য যুগোপযোগী গ্রন্থ)

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় • বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

(প্রশ্নোত্তরে)

সংসদের নমুনা প্রশ্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত নমুনা কপি না পেয়ে থাকলে সরাসরি লিখুন

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

সে ততক্ষণে পিছনের চাকার হাওয়া খুলে দিয়েছে।

দিকে তাকায়, পিছনের চাকাটা বেশ বসে গেছে।

ইতিমধ্যে ড্রাইভারও ফিরে এসেছে। সামনের দরজাটা খুলে কী একটা রেখে সবে দরজাটা বন্ধ করেছে এমনি সময়ে ছোটকার জীপটা ঝড়ের বেগে ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়ায়। ছোটকা লাফিয়ে নামতেই চারজন সশস্ত্র কনেস্টবলও সিঁড়ির মুখে পজিশন নেয়। ছোটকাকে দেখে সোনারও সাহস বাড়ে। সেও তার গুলতিতে মার্বেল লাগিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়ায়। এরই ভেতর ছোটকা ও সোনার মধ্যে একবার চোখের ইশারা হয়ে গেছে। ড্রাইভার কেমন যেন থতমত খেয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঠিক সেই মহূর্তে ওপর থেকে ওরা তিনজনই নেমে আসে। সবার আগে মোটা ষণ্ডা গোছের লোকটা। আর কী কাণ্ড! লোকটাকে দেখেই ছোটকা বুটে বুট ঠুকে খটাস করে স্যালুট মারে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য চারজন পুলিশও।

সোনা বেশ চালাক, সে বুঝতে পারে, তার কোথাও নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে। লোকটাকে ডাকাতের মতো দেখতেও নয়। বেশ বয়েস হয়েছে, সম্ভ্রান্ত রাশভারি চেহারা। পিছন থেকে দেখেছিল বলে সে বুঝতে পারেনি। তাছাড়া উত্তেজনায় তার মাথার ঠিক ছিল না।

এর পর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সেটুকু সে বুঝতে পারে। টুক করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে, সোজা তিনতলায় ঠাকুরমার ঠাকুরঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। ভাগ্যিস এই সময় ঠাকুরমা দোতলায় তাঁর নিরামিষ রান্নাঘরে থাকেন।

পরের কথা আর বেশি লিখবো না। সে অনেক কথা, অনেক হাসাহাসি, ঠাকুরঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি। তারপর চা বিস্কুট কেক মিষ্টি যেন বাড়িতে একটা উৎসব লেগে গেল। গাড়ির চাকা বদলানোর সময়টুকু পুলিশের বড়কর্তা ওদের বাড়িতেই বসেছিলেন।

তিনিও ওকে ক্ষমা করেছিলেন, যাবার সময় অনেক আদরও করে গেলেন।

আর ছোটকা? প্রথমে রেগে গেলেও পরে মহা খুশি। হাজার হোক সোনার দৌলতেই পুলিশের অত বড় অফিসার তার বাড়িতে ঘণ্টাখানেক বসে চা মিষ্টি খেয়ে গেলেন। তবে একবার ফস্কে গেলেও ভবিষ্যতে যে সোনা আর গোয়েন্দাগিরি করবে না এমন কথা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যায় না।

ছবি · বজ্রতবরণ চক্রবর্তী

জানো কী

- সবাই চিনতো তাঁকে, নামও জানতো, কিন্তু ঐ পরিচয়টা যে আসলে একটা আড়াল তা কেউ জানতো না। তারপর হঠাৎ একদিন..... গোয়েন্দা, পুলিশ, খুন....কিন্তু কেন?
- রিয়ার ওপরে ওরা রেগে আগুন। ওর জন্যেই তো সকলের মায়ের সঙ্গে মার্কেটিংএ যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কি করেছে রিয়া?
- ডাকবাংলোয় ঢুকতেই মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির কাঁটা খচ করে উঠলো। সেই কাঁটাই যে অমন সর্বনাশা হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানতো! কি হলো শেষ পর্যন্ত?
- ছোটভাই যা খুশি তাই বলে। বড়ভাই কিছু বলে না। কিন্তু একদিন.....কি হলো?
- এতো চেষ্টা করেও ম্যাম'জেল পারলো না। কনরাড ধরা পড়ে গেলো সার্জেন্টের হাতে। তাকে উদ্ধার করতে ম্যাম'জেল এবার কি করবে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবে অগ্রহায়ণ মাসের শুকতারায়। সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু।

পিটা

কাজল ভট্টাচার্য

ক্রুশে নিহত যিশু মাতা মেরীর কোলে চিরনিদ্রায় শায়িত। যিশুর হাত ও পায়ের পাতায় পেরেকের ক্ষত। মুখে বিরাজ করছে অপার্থিব প্রশান্তি। মাতা মেরীর দৃষ্টি বিষাদঘন। তাকিয়ে আছেন নিহত পুত্রের দিকে। ভাস্কর্যটির সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ছে বেদনা।

এই হলো পিটা। মাইকেল এঞ্জেলোর এক অপূর্ব সৃষ্টি। শোক নামে বিমূর্ত ধারাটি যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে এর মধ্যে।

৬ মার্চ ১৪৭৫ সালে ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন মাইকেল এঞ্জেলো। লরেঞ্জো ডি মেডিসির স্কুলে ভাস্কর্য তৈরির পাঠ নেন তিনি। জনৈক ব্যাঙ্কার জ্যাকোপ গ্যালীর অনুরোধে তিনি গ্রীক সুরা-দেব ব্যাকাসের একটি ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কাজ মুগ্ধ করেছিল গ্যালীকে। কার্ডিনাল জিন ডি লা গ্রোলায়ী তখন সেন্ট পিটারস গির্জায় ধর্মীয় ভাস্কর্য স্থাপনের জন্য চিন্তা ভাবনা করছিলেন। গ্যালী কার্ডিনালের সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলোর আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রথমে কার্ডিনাল রাজী হননি, পরে কি মনে করে ভাস্কর্য গড়ার দায়িত্ব দিলেন তাঁকেই। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে এঞ্জেলো হাত দিলেন পিটা-র নির্মাণকাজে। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা, তিনশো পাউন্ড ওজনের এই ভাস্কর্যটির কাজ শেষ হয় ১৫০০ সাল নাগাদ।

পিটা কয়েকটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগে যিশুর যত মূর্তি তৈরি করা হতো সেসবই হতো আকৃতিতে ছোট।

সেই প্রথা ভেঙে এঞ্জেলো যিশুকে প্রমাণ মাপের করে গড়ে তুললেন। মেরীকে মধ্যবয়স্কার চেহারায় উপস্থিত না করে ফুটিয়ে তুললেন তাঁর সেই বয়স যা ছিল যিশুর জন্মের সময়ে। কার্ডিনাল গ্রোলায়ীর মনে হয়েছিল মেরীকে যিশুর থেকেও কমবয়েসী দেখাচ্ছে। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে এঞ্জেলো বলেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি বয়স কুমারী মেরীকে স্পর্শ করতে পারে না। জবাব শুনে গ্রোলায়ী সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

পিটা একমাত্র ভাস্কর্য যাতে মাইকেল এঞ্জেলো তাঁর নাম উৎকীর্ণ করেছেন। মেরীর কাঁধ থেকে নিচে নেমে যাওয়া মার্বেল পাথরের খাঁজটির ওপর তিনি 'ফ্লোরেন্সের মাইকেল এঞ্জেলো কর্তৃক নির্মিত' কথাগুলি খোদাই করে দিয়েছেন।

পিটা-র নিঃস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ উঠল ১৯৭২ সালের ২১ মে তারিখে। হাঙ্গেরি-জাত এক অস্ট্রেলিয়ান উন্মাদ যুবক কোত্থেকে উপস্থিত হয়ে হাতুড়ি নিয়ে আক্রমণ করেছিল ভাস্কর্যটিকে। লোকজন তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার আগেই সে পনেরোটি আঘাত করতে পেরেছিল। তাতেই টুকরো হয়ে যায় মেরীর চোখের পাতা, নাক এবং বাঁ হাত।

ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্যটির পূর্বরূপ ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় মেরী আবার তাঁর আগের চেহারা ফিরে পেলেন ১৯৭২ সালের বড়দিনের কিছু আগে।

সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকার প্রদর্শন কক্ষে আজ পিটা রয়েছে বুলেটপ্রুফ কাচের আড়ালে। কাচের ঘেরাটোপের ওপারে মাতা মেরী যিশুকে কোলে নিয়ে ঠিক সেই ভঙ্গিটিতে বসে, একসময় তাঁকে যেভাবে স্থাপন করেছিলেন মাইকেল এঞ্জেলো।

বাংলার শেষ দ্বারপাল

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আঃ! কে আছ রক্ষা কর.....আগুন..... আগুন..... রক্ষা কর ভগবান তথাগতকে.....

ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন গোবিন্দপাল, আর তারপরই ভেঙে গেল ঘুমের ঘোর। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন।

আজও রাতে সেই দুঃস্বপ্নটা দেখেছেন উনি। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। আগুন জ্বলছে। দাউ দাউ করে আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। সে আগুনে ঢাকা পড়েছে করুণাঘন বুদ্ধের এক বিশাল মূর্তি।

ইতিমধ্যে মহারাজের চিৎকার শুনে ছুটে এসেছে প্রাসাদের সদাসতর্ক রাতের প্রহরীরা। সম্রাট, সম্রাট, আদেশ করুন।

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন গোবিন্দপাল। ইঙ্গিতে প্রহরীদের ফিরিয়ে দেন। তারপর বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়ান জানালার সামনে। বাইরে অন্ধকার রাত।

সম্রাট! আপন মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেন গোবিন্দপাল। আজও রাজকর্মচারীরা তাঁকে 'সম্রাট' বলে সম্ভাষণ করে। মাঝে মাঝে পরিহাস মনে হয়। সাম্রাজ্যের কতটুকুই বা আর অবশিষ্ট আছে।

সুদীর্ঘ প্রায় চারশো বছর যে পাল রাজবংশ সমগ্র গৌড়বঙ্গ-মগধ সহ সারা আর্যাবর্ত শাসন করেছে তাদেরই এই সর্বশেষ বংশধরটির আজ রাজ্যসীমা বলতে মগধের এক ছোট্ট ভূখণ্ড। রাজধানী উদ্দণ্ডপুর।

কিন্তু কেন এমন হলো? গোপাল-ধর্মপাল-দেবপাল-রামপালের এই বংশধরটির শক্তি এবং সাহস তো তাঁর পূর্বপুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তবে কেন একটার পর একটা ভূখণ্ড হাতছাড়া হয়ে গেল? গৌড়বঙ্গ অধিকার করে নিয়েছে সেনরাজ্যরা। বরেন্দ্র এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও এক একটা ছোটখাট স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছে। দীর্ঘ সময় ধরে ভেতরে ভেতরে জীর্ণ হয়ে পড়েছিল পাল সাম্রাজ্য। তবে কি সব দোষ পাল রাজপুরুষদেরই?

না। আসলে ভারতবর্ষের সময়টাই খারাপ চলেছে। সমগ্র উত্তরাপথে দুর্যোগের ঘনঘটা। কোনো ঐক্যবদ্ধ রাজশক্তি নেই। সবাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লড়াইয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে বিধর্মী বহিঃশত্রুর দল। তারা খোলা তলোয়ার

হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একটার পর একটা রাজ্যে। একের পর এক প্রাচীন রাজবংশগুলি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে বিদেশী আক্রমণের চাপে।

প্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারতবর্ষে এ সময়ে ভাঙার পালা চলেছে। সে হারিয়ে ফেলছে তার পূর্ব গরিমা। মানুষের জীবন যে ধর্মের ভিতের উপর গড়ে উঠেছিল ইদানিং তাও নষ্ট হতে শুরু করেছে। সারা ভারতবর্ষ ডুবতে শুরু করেছে স্বার্থপরতা আর বিলাসিতায়।

গোবিন্দপাল তাকিয়ে থাকেন দূর অন্ধকার প্রকৃতির দিকে। ঘুমিয়ে আছে বিশ্ব চরাচর। শুধু জেগে আছে আকাশের চাঁদ আর লক্ষ কোটি তারার দল।

হঠাৎ চমকে ওঠেন তিনি, আগুন! ওই তো আগুন জ্বলছে। তবে কি যা দেখেছেন তা স্বপ্ন নয়?

ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে একটানা একটা কুকুরের করুণ কান্না ভেসে এল। ছিন্ন হয়ে গেল রাতের স্তব্ধতা। আর তখনই মহারাজ স্বাভাবিক হলেন। না, ও আগুন নয়। ও তো মশাল জ্বলছে দূরে উদ্দণ্ডপুর বৌদ্ধ মহাবিহারের শীর্ষদেশে।

উদ্দণ্ডপুর মহাবিহার! বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার এই পূণ্য পীঠভূমি একদা গোবিন্দপালের পূর্বপুরুষেরাই নির্মাণ করেছিলেন। গোবিন্দপাল শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও রক্ষা করবেন এর মর্যাদা।

একটা দমকা বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিল মহারাজের শয়নকক্ষের একশো প্রদীপের শিখা।

পরদিন সকালবেলা ধনঞ্জয় বর্মা এল খবর নিয়ে। ধনঞ্জয় মহারাজ গোবিন্দপালের একাধারে বন্ধু এবং অমাত্য। শক্তপোক্ত

চেহারা। মনেও খুব সাহস। গোবিন্দপাল তাকে পাঠিয়েছিলেন সীমান্তের ওপারের খবর নিয়ে আসতে।

সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে ধনঞ্জয় বর্মা গিয়েছিল মগধের উত্তরে গহড়বাল রাজ্যে। রাজ্যটা এককালে পালেদেরই ছিল। এখন তা দখল করে রয়েছে এক তুর্কী আক্রমণকারী মহম্মদ-ই-বখতিয়ার।

কে এই বখতিয়ার? তার জন্ম সুদূর তুর্কভূমিতে। সে খলজি সম্প্রদায়ভুক্ত। সেখান থেকে মুসলমান আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতে এসে প্রবেশ করে। তারপর এদেশের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে গহড়বাল রাজ্যটার একটা অংশ দখল করে নেয়। কিন্তু এতে সে তুষ্ট নয়।

তার আসল লক্ষ্য মগধের পথ দিয়ে ঢুকে বাংলা জয় করা। সে শুনেছে গৌড়বঙ্গ এক সোনার দেশ। এখানে মাটিতে সোনা ফলে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বখতিয়ার নানা স্থানে লুঠপাট চালিয়ে বিস্তর ধনরত্ন জমিয়ে ফেলেছে। সেই অর্থে একটা সেনাদলও গঠন করে ফেলেছে। এখন যে কোনোদিন সে সসৈন্যে মগধের পথে যাত্রা শুরু করতে পারে।

সব খবর সংগ্রহ করেই ফিরেছে ধনঞ্জয়। আর দেরি না করে গোবিন্দপাল তাঁর গুপ্তমন্ত্রণা কক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা ডাকলেন পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য।

মন্ত্রণাকক্ষে মহারাজা গোবিন্দপাল আর ধনঞ্জয় বর্মা ছাড়া উপস্থিত ছিল এ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি বাসুদেব, মহাসন্ধিবিগ্রহিক সুবর্ণকেতু, প্রধান মহামন্ত্রী ও কয়েকজন সেনানায়ক।

মহামন্ত্রী তাঁর পাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, বিধর্মীরা যে আক্রমণ করতে পারে এ খবরটা কিভাবে যেন রটে গেছে মহারাজ। দলে দলে মানুষ রাজ্য ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে।

কিন্তু এভাবে পালিয়ে তারা কতদিন বাঁচতে পারবে, মহামন্ত্রী?

ধনঞ্জয় বর্মা তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে, আজ আমরা সব কিছু হারিয়ে শুধু পালিয়ে বাঁচতে চাইছি। কিন্তু এভাবে সত্যি বাঁচা যায় না।

এ নিয়তির বিধান অমাত্য ধনঞ্জয় বর্মা, এতক্ষণ বাদে মুখ খোলে প্রধান সেনাপতি বাসুদেব, আমাদের এই সমাজ আর রাষ্ট্রব্যবস্থায় পাপ ঢুকেছে।

চুপ করুন প্রধান সেনাপতি। পাপপুণ্যের দোহাই দিয়ে নিজেদের কাপুরুষতা ঢাকার চেষ্টা আরও বড় পাপ। বলতে বলতে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন গোবিন্দপাল। ফিরে তাকিয়ে বললেন, মহাসন্ধিবিগ্রহিক সুবর্ণকেতু!

আদেশ করুন মহারাজ।

আপনি আজই সমস্ত প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে খবর পাঠান আর নিজে যান গৌড়বঙ্গে। গৌড়সম্রাটকে আমার বার্তা জানিয়ে বলবেন, দেশের এই সংকটে অন্তত এখনকার মতো আমাদের নিজেদের সব বিবাদ ভুলে যাওয়া উচিত। যদি গৌড় অধিপতি চান আমি এক সাধারণ সৈনিক হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী আছি।

কিন্তু মহারাজ, প্রধান সেনাপতি বাসুদেব পালনৃপতির কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলো, গত কয়েক বছরের অনবরত যুদ্ধে আমাদের সেনাবল অনেক কমে গেছে। নতুন করে আর একটা যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

আপনি কি বলতে চান?

তার চেয়ে বরং, ঢোঁক গিলে নিয়ে বাসুদেব বলে, বখতিয়ারের সঙ্গে একটা সন্ধি করে ফেললে হতো না। এতে হয়তো মহারাজের সিংহাসনটাও বাঁচবে, আর.....

চুপ করুন সেনাপতি, বাসুদেব তার প্রস্তাব শেষ করার আগেই চেঁচিয়ে উঠলেন গোবিন্দপাল, আপনি যদি এ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি না হতেন তবে আপনাকে কঠিন শাস্তি দিতাম। ভুলে যাবেন না, গত কয়েক শো বছর যাবৎ এই পাল রাজবংশই রক্ষা করেছে গৌড়বঙ্গ-মগধের সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রের ইমারত। আমি দেখতে পাচ্ছি যারা আসছে তারা ধ্বংস করবে সব কিছু। আমি প্রাণ থাকতে তা হতে দেব না।

আমরা প্রাণ দেব কিন্তু মান দেব না। সমস্বরে বলে উঠলো ধনঞ্জয় বর্মা সহ আরও কয়েকজন সেনানায়ক।

বাসুদেব মাথা নিচু করে বসে রইলো।

ভয়ঙ্কর খবরটা কদিন বাদেই জানা গেল। পাল সেনাপতি বাসুদেব তার অনুগত সেনাদের নিয়ে গোপনে গিয়ে যোগ দিয়েছে খলজি শিবিরে। শুধু তাই নয়, নতুন ধর্ম গ্রহণ করে নাম নিয়েছে গিয়াসুদ্দিন বেগ। তার ধারণা মগধ রাজ্য আর উদ্দণ্ডপুর অধিকার করে বখতিয়ার তাকেই সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করবে।

এমন একজন বিশ্বাসঘাতককে সঙ্গে পেয়ে বখতিয়ার তো আহ্লাদে আটখানা। মহা উৎসাহে সে তার সৈন্যদল নিয়ে ছুটে আসছে মগধের দিকে। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে গিয়াসুদ্দিন বেগ।

খবরটা শুনে অস্থির হয়ে উঠেছেন গোবিন্দপাল। একেই তাঁর রাজ্য ছোট, সেনাবাহিনীও বড় নয়, এর মধ্যে আবার সেনাদলের এক অংশকে সঙ্গে নিয়ে বিপক্ষদলে যোগ দিয়েছে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। তাহলে কাদের ভরসায় তিনি সেই বিদেশী হানাদারদের মুখোমুখি হবেন?

বন্ধু ধনঞ্জয় বর্মা বললো, মহারাজ, আমরা নতুন সেনাদল গড়ে তুলবো।

সময় কোথায় ধনঞ্জয়? একেই সারা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেছে। তুর্কী আক্রমণকারীরা আসছে শুনে আতঙ্কে পালাতে

শুরু করেছে সাধারণ প্রজারা....

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন প্রহরী এসে জানায় উদ্দণ্ডপুর মহাবিহারের প্রধান অধ্যক্ষ মহারাজের সাক্ষাৎ চান। তিনি নিজে এসেছেন।

তিনি স্বয়ং এসেছেন! কি সৌভাগ্য আমার। শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ান গোবিন্দপাল। তারপর দ্রুত এগিয়ে যান বৌদ্ধ আচার্যকে অভ্যর্থনা করার জন্য।

মহাধ্যক্ষের কথাগুলো অবাক হয়ে শুনলেন গোবিন্দপাল। এও কি সম্ভব? স্বদেশ এবং স্বজাতিকে রক্ষা করার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেবে উদ্দণ্ডপুর এবং নালন্দা মহাবিহারের প্রতিটি শিক্ষার্থী! তারাই পূরণ করবে মহারাজ গোবিন্দপালের সেনাশক্তি!

কিন্তু বাস্তবে একি সম্ভব মহাচার্যদেব? বিহারের শিক্ষার্থীরা সংসারত্যাগী শ্রমণ। শাস্ত্রচর্চাতেই তাদের দিন কাটে। তারা অহিংস পরমপুরুষ তথাগতের সেবক....

কথা শেষ হয় না গোবিন্দপালের, তার আগেই প্রধান অধ্যক্ষ বলেন, বিপদের মুহূর্তে দেশকে রক্ষা করাই প্রতিটি দেশবাসীর ধর্ম। বুদ্ধধর্ম এবং সংঘকে রক্ষা করার এ ছাড়া বোধকরি আর কোনো উপায় নেই।

এই অল্প সময়ের মধ্যে ওই অপটু তরুণ সন্ন্যাসীদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাবে কে? ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন গোবিন্দপাল।

আমি। উঠে দাঁড়ায় ধনঞ্জয় বর্মা। এ দায়িত্ব আপনি আমায় দিন মহারাজ। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো।

ধনঞ্জয়, তুমি শুধু আমার বন্ধু নও, আমার ভাই। ধনঞ্জয় বর্মাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন গোবিন্দপাল। তাঁর দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে।

এর পরের ঘটনার কথা লেখা আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

১১৯৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ এক বিশাল সেনাদল নিয়ে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার এসে মগধ আক্রমণ করলো। তাদের লক্ষ্য মগধের পথে গৌড়বঙ্গে প্রবেশ করা। ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়েও সেদিন বিধর্মী হানাদারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শেষ পালরাজা গোবিন্দপাল। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন প্রতিরোধ। সে এক আশ্চর্য কাহিনী।

বাহিনীর সম্মুখভাগে গোবিন্দপালের নেতৃত্বে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী। তাদের পেছনে এক বিচিত্র সেনাদল। এমন সৈন্যবাহিনী আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ দেখেনি। এই সেনাদলের প্রতিটি সৈনিকের মুণ্ডিত মস্তক, পরনে হলুদ রঙের বস্ত্র। এরা উদ্দণ্ডপুর ও নালন্দা মহাবিহারের শিক্ষার্থী শ্রমণ দল। কিন্তু এখন তাদের হাতে তালপাতার পুঁথি নেই, তার বদলে রয়েছে তীর-ধনুক, বল্লম আর কুঠার। দেশ আর ধর্ম রক্ষার জন্য তারা শাস্ত্র ছেড়ে অস্ত্র ধরেছে। মন্ত্রের সাধনা কিংবা শরীর পাতন এই তাদের মন্ত্র।

ভোঁ.....ভপ্.....ভপ্.....ভপ্.....দ্রিম্.....দ্রিম্।

তীব্র শব্দে শিঙ্গা বেজে উঠলো। সেই সঙ্গে জয়ঢাকের গুরু-গম্ভীর আওয়াজ।

দূরে শত্রুসৈন্য দেখা গেছে। ঘোড়াসওয়ার বাহিনী ছুটে আসছে খোলা তলোয়ার হাতে। ওই তুর্কী সেনাদলের নায়ক বখতিয়ার খলজি। সে যেমন দুর্মদ, তেমনি নিষ্ঠুর। আসার পথে একটার পর একটা জনপদ লুণ্ঠন আর ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে আসছে সেই বাহিনী।

শুরু হলো দুপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই। সারাদিন চললো যুদ্ধ। এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কেউ কোনোদিন দেখেনি। একদিকে আক্রমণকারী হানাদার তুর্কীবাহিনী। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো ন্যায়নীতিই মানে না। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে প্রাচীন গৌরবময় পাল রাজবংশের শেষ বংশধর গোবিন্দপাল। পূর্বপুরুষের সামরিক বল বা রণদক্ষতা তাঁর নেই, কিন্তু আছে জননী জন্মভূমির প্রতি অসামান্য ভালবাসা। এ বিপদে কোনো প্রতিবেশী রাজশক্তিই তাঁকে সাহায্য করেনি। নিজের সেনাবাহিনীর এক অংশ বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে। তবু পালিয়ে বাঁচতে চাননি গোবিন্দপাল। তবে বিপদের সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আর একদল সৈনিক, উদ্দণ্ডপুর নালন্দার বৌদ্ধ শ্রমণরা। কিন্তু এ অসম যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া যায়, জেতা যায় না।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও পরাজিত ও নিহত হলো সমগ্র পাল সেনাবাহিনী। অস্ত্রধারী বৌদ্ধ শ্রমণরা দলে দলে প্রাণ দিল।

উল্লাসে চিৎকার করতে করতে তুর্কীবাহিনী প্রবেশ করলো উদ্দণ্ডপুর মহাবিহারের মধ্যে। পাহাড়ের ওপর বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার এই বিশাল প্রতিষ্ঠানটিকে তারা বোধহয় দুর্গ ভেবেছিল। বখতিয়ার খলজি বিজয় উৎসব পালন করলো সমস্ত বিহারটিতে আগুন ধরিয়ে।

দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল উদ্দণ্ডপুর বিহারে সঞ্চিত বহু যুগের ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সূত্রগুলি, অমূল্য সব পুঁথি। যে কজন বৌদ্ধশ্রমণ সেদিন রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা হাতের কাছে যে কটা পুঁথি পেয়েছেন তা নিয়ে চলে গিয়েছেন প্রতিবেশী রাজ্য তিব্বত, নেপাল কিংবা সিংহলে।

তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিরোধকারী বাংলার দ্বারপাল গোবিন্দপালের মৃতদেহ ধুলোয় পড়ে রইলো উদ্দণ্ডপুর মহাবিহারের সামনে। বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের পথ পরিষ্কার হলো।

ছবিঃ সুফি

ভবিষ্যতের ঠিকানা

পদ্মা চৌধুরী

আই. এ. এস.

প্রতি বছরই দেশের বড় বড় খবরের কাগজগুলিতে আই. এ. এস. এবং তার সমতুল পরীক্ষার নোটিশ প্রকাশিত হয়। গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রী এই সব পরীক্ষাগুলিতে অবশ্যই বসতে পারেন। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে এক বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা করলে আই. এ. এস. বা অন্যান্য সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। তবে হ্যাঁ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে ফল ভালো করেন। নবম শ্রেণী থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

ইদানীং আই. এ. এস. পরীক্ষাগুলি দুটি ভাগে নেওয়া হয়। প্রথমটি অবজেকটিভ টাইপ—সাধারণত জুন মাসে হয়। আর মূল লিখিত পরীক্ষা হয় নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে।

এবার আসি কি কি যোগ্যতা থাকলে আই. এ. এস. পরীক্ষায় বসা যাবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা—বি. এ./বি. এস-সি/বি. কম./বি. ই. পাশ হওয়া চাই।

বয়স—১ আগস্ট তারিখে বয়স হওয়া চাই ২১ থেকে ২৮-এর মধ্যে। তফসিল জাতি/ উপজাতিদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্ব সীমায় পাঁচ বছরের ছাড় আছে অর্থাৎ ৩৩ বছর পর্যন্ত হলেও চলবে।

আই. এ. এস. বা সমতুল পরীক্ষাগুলি সাধারণত নিচের সার্ভিসগুলির ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়—

1. Indian Administrative Service (I.A.S)
2. Indian Foreign Service (I.F.S.)
3. Indian Police Service (I.P.S.)
4. Indian Railway Service (I.R.S.)
5. Indian Postal Service (I.P.S.)
6. Indian Income Tax Service (I.I.T.S.)
7. Indian Audit & Accounts Service.
8. Indian Defence Accounts Service.
9. Indian Customs & Central Excise Service.
10. Indian Ordnance Factories Service.

প্রাথমিক পরীক্ষা দু'টি পেপারে ৪৫০ নম্বরের অবজেকটিভ ধরনের হয়। এই দু'টি পেপার হলো সাধারণ বিষয়—১৫০ নম্বর; ঐচ্ছিক বিষয়—৩০০ নম্বর।

ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে আছে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদি।

আর মূল লিখিত পরীক্ষাটি হবে ৮টি পেপারের, প্রতিটি ৩০০ নম্বরের। প্রশ্ন থাকবে প্রবন্ধ ধরনের।

প্রথম পেপার—১৫টি ভারতীয় ভাষার যে কোনো একটি, ৩০০ নম্বর।

দ্বিতীয় পেপার—ইংরাজি, ৩০০ নম্বর।

তৃতীয় ও চতুর্থ পেপার—জেনারেল স্টাডিজ, ৩০০ নম্বর।

পঞ্চম থেকে অষ্টম পেপার—প্রতিটি পেপারে থাকবে দু'টি ঐচ্ছিক বিষয়। বিষয়গুলির মধ্যে আছে—অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অঙ্ক, আইন, রসায়নবিদ্যা, নৃতত্ত্ববিদ্যা, হিসাবশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জীববিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, পরিসংখ্যান শাস্ত্র, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, পশুচিকিৎসা শাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, বাণিজ্য ইত্যাদি।

প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রতিটি পেপার দু'ঘণ্টা এবং প্রধান পরীক্ষায় প্রতিটি পেপার তিনঘণ্টা করে।

ইন্টারভিউ—এতে থাকবে ২৫০ নম্বর। ব্যক্তিগত পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, মানসিক শক্তি, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা, চারিত্রিক অখণ্ডতা প্রভৃতি দেখা হয়।

শারীরিক পরীক্ষা—শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ হতে হবে। কোনোরকম বৈকল্য থাকলে চলবে না।

দৃষ্টিশক্তি হবে এই রকম—

Class of Service	দূরের দৃষ্টি		কাছের দৃষ্টি	
	ভাল চোখ	খারাপ চোখ	ভালো চোখ	খারাপ চোখ
1. Non-Technical: (I.A.S., I.F.S., I.A.A.S. Indian Postal Service, Indian Customs Service ইত্যাদি)	6/9	6/12	J/I	J/II
2. Technical: (I.P.S., Indian Rly., Traffic Service, ইত্যাদি)	6/6	6/12	J/I	J/II

এ ব্যাপারে বিশদভাবে জানতে হলে তোমাদের যোগাযোগ করতে হবে নিচের ঠিকানায়—

The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahajahan Marg, New Delhi—11.

হাঁদা-ভোঁদার

খেলনা ইঁট

খেলাঘর তৈরির ইঁট দিয়ে কি করছিস রে, ভোঁদা? বাড়ি তৈরির খেলা খেলছিস?
হ্যাঁ, কিন্তু তুই এখানে কেন?

আমিও খেলতে এসেছি। দে ইঁটগুলি আমাকে দে, দ্যাখ, আমি কেমন চমৎকার সব বানাতে পারি!
আরে, আরে! এটা কি হচ্ছে?

দ্যাখ! আমি কেমন সিঁড়ি তৈরি করেছি, এখন আমি অনায়াসে পুডিংটায় হাত লাগাতে পারি।

পেয়েছি এটা!
আমি বল গড়িয়ে লক্ষ্যবস্তুতে লাগাবার খেলা খেলি!

আঁইইই!

হোঃ হোঃ! তোর উপযুক্ত প্রতিফল হয়েছে।
গরর! এই সাড়াশব্দে এখুনি পিসেমশাই ছুটে আসবে। তার আগেই এগুলো নিয়ে কেটে পড়ি।

পরে বাইরে
অ্যাই, হাঁদা! তুই আমার ইঁটগুলি ফিরিয়ে দে!
ঘাবড়াচ্ছিস কেন! এগুলো আমার গুলতির দারুণ গুলির কাজ করছে-

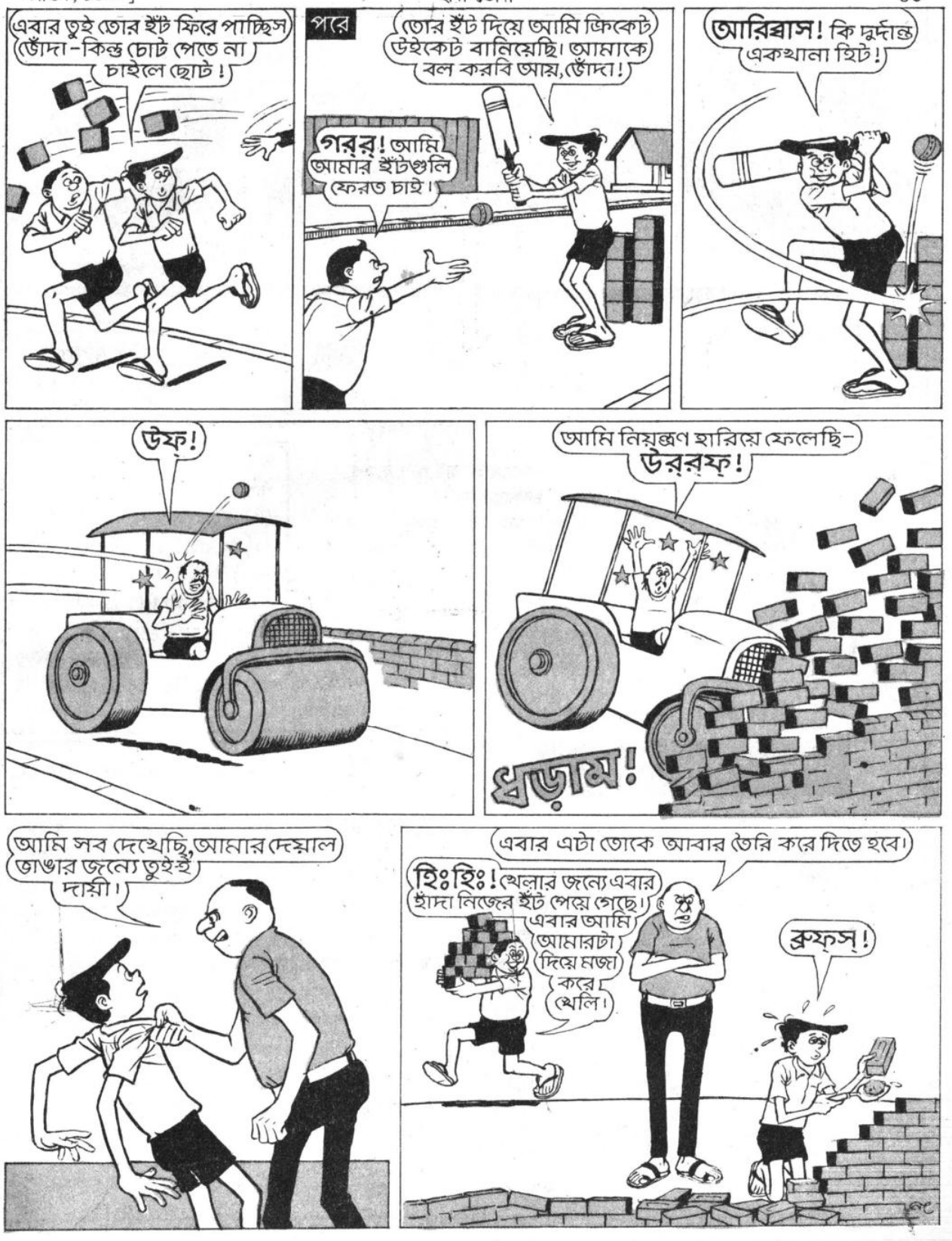
এবার তুই তোর ইঁট ফিরে পাচ্ছিস ভোঁদা - কিন্তু চোট পেতে না চাইলে ছোট!
পরে
তোর ইঁট দিয়ে আমি ক্রিকেট উইকেট বানিয়েছি। আমাকে বল করবি আয়, ভোঁদা!
গর্‌র্‌! আমি আমার ইঁটগুলি ফেরত চাই।
আরিব্বাস! কি দুর্দান্ত একখানা হিট!
উফ্!
আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি- উর্‌র্‌ফ্!
ধড়াম!
আমি সব দেখেছি, আমার দেয়াল ভাঙার জন্যে তুইই দায়ী!
এবার এটা তোকে আবার তৈরি করে দিতে হবে।
হিঃহিঃ! খেলার জন্যে এবার হাঁদা নিজের ইঁট পেয়ে গেছে। এবার আমি আমারটা দিয়ে মজা করে খেলি।
ব্রুফস্!

নতুন ধাঁধা

১। তিন অক্ষরে পাবে তারে
পথে যেতে যেতে।
পদহীন করে তারে
পাবে শস্যক্ষেতে।

—মাম নায়ক
হিলভিউ, আসানসোল

২। যখন আমি এলাম
তখন তুমি এলে না
পরে তুমি এলে
সর্বস্ব খেলে
আবার আমায় ছেড়ে
চলেও গেলে।

—দেবু, মকর, মানসী
উষাগ্রাম, আসানসোল

৩। পদবী কিনা জানাইও
তবুও নয় যন্ত্রযানও।

—দেবাশিস সাহা
বিজয়গড়, কলকাতা—৩২

৪। আগাগোড়া তার জন্য হলেও
মধ্যিখানে 'কি'?
আমার কোনো চালচুলো নেই
তাই যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—মায়া ও রুমা মণ্ডল
খাঁড়শুলি বাজার, রানীগঞ্জ

ভাদ্র সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরঃ
১। র ২। তাড়কা ৩। পছন্দ
৪। শাল

ভাদ্র সংখ্যার শব্দমালার উত্তরঃ
পাশাপাশিঃ (১) চুরুলিয়া (২) দুখু মিয়া (৮) লাঙল (৯) বিদ্রোহী (১০) বিজলী (১১) অর্ঘ্য (১৫) বসন্ত (১৬) দোলন-চাঁপা (১৭) নূরজাহান।
উপর-নিচঃ (৩) বিষের বাঁশী (৪) হান্‌স হফ (৫) প্রমীলা (৬) করাচি (৭) নবযুগ (১২) বিষ্ণুপ্রিয়া (১৩) অগ্নিগিরি (১৪) বুলবুল।

বলো তো আমি কে?

সূত্র হেঁয়ালি

বিখ্যাত এক কাহিনীর চরিত্র আমি। আমাকে চিনতে হলে নিচের সূত্রগুলো দেখঃ

সূত্র একঃ যখন আমি খুব ছোট তখন সন্ধ্যার সময় দাওয়ায় ছেঁড়া কাঁথা পাতা বিছানায় বসে পিসির মুখে রূপকথা আর ডাকাতের গল্প শুনতাম। পিসি খানিকটা ছড়া কেটে চুপ করলেই আমি তার বাকি অংশ বলে দিতাম।

সূত্র দুইঃ মার সঙ্গে ঝগড়া হলেই পিসি বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। আবার ফিরেও আসত। কিন্তু একবার সেই যে গেল আর ফিরল না।

সূত্র তিনঃ বড় হলেও সারাদিন আমি গ্রামে টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম। কোন ঝোপে বৈঁচি পাকল, কাদের বাগানে কোন গাছটায় আমের গুটি বেঁধেছে, কোন বাঁশতলায় শেয়াকুল খেতে মিষ্টি—সব ছিল আমার নখদর্পণে।

সূত্র চারঃ একবার এই রকম পাড়া বেড়িয়ে বাড়ি ফিরেই দেখি গ্রামের সেজ ঠাকরুন তাঁর মেয়ে ও দেওরের ছেলেকে নিয়ে আমার পুতুলের বাক্সে কি খুঁজছেন। সেদিন তাঁর মেয়ের পুঁতির মালা আমার বাক্স থেকে বেরুতে মার কাছে কি মারটাই না খেয়েছিলাম।

সূত্র পাঁচঃ ছোট ভাইটি ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। একবার সে ও আমি গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়ে একটা পলকাটা চকচকে জিনিস পাই। হীরে মনে করে সেটা আমি বাড়ি নিয়ে আসি।

এবার বলো তো আমি কে? প্রথম সূত্র থেকে যদি ধরতে পারো তাহলে বলব অসাধারণ; দ্বিতীয় সূত্র থেকে হলে চমৎকার; তৃতীয় সূত্র থেকে খুব ভালো; চতুর্থ সূত্র ভালো; আর পঞ্চম সূত্র হলে মোটামুটি।

আমার নাম? পরের পাতায় দেখ।

নতুন শব্দমালা

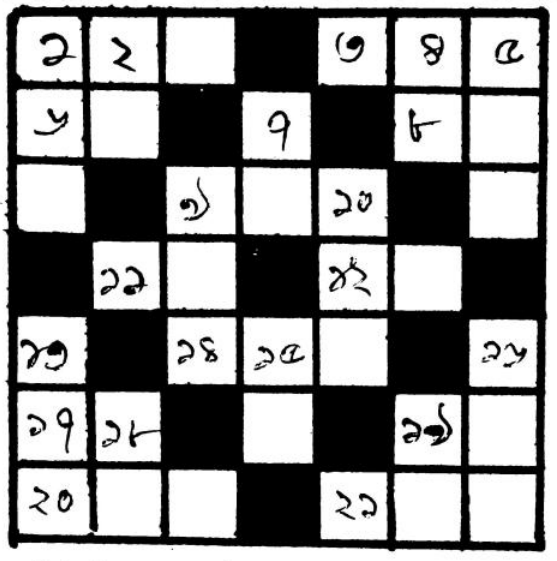

এটি তৈরি করেছেনঃ গৌতম গুলই ,দাশনগর, হাওড়া

সূত্রঃ

পাশাপাশিঃ

১। বহুমূল্য মাণিক্য শব্দটি তাই বলে
৩। সূত্র হেথায় আসে ব্যাধের থেকে
৬। জল নেই হেথা শুধু ধুধু বালুরাশি
৮। সমান সমান হয়, নয় কম বেশি
৯। সূত্রটা খুঁজে তুমি পেতে পার খনিতে
১১। 'পতাকা' উড়ছে ঐ পতপত ধ্বনিতে
১২। হেথায় বসে আছেন দেখি পার্বতী সহচরী
১৪। পাপ করলেই এইখানে ঠাঁই, সবাই জানো কি ?
১৭। নিযুক্ত ঠিক, বি-যোগেতে করতে বারণ করে
১৯। ধর্মের কাজ, পালে সবাই পুণ্যলাভের তরে
২০। চলে গান বাজনা সারারাত ধরে
২১। বিষধর সাপ ঐ ফোঁস ফোঁস করে

ওপর-নিচঃ

১। প্রথমেই আসে এক সুন্দরী নারী
২। এইখানে আছে 'গাছ', সূত্রটা তারই
৪। বিখ্যাত পূর্ণিমা কৃষ্ণ লীলার
৫। সূর্য ডুবলে পরে ঘনায় আঁধার
৭। পাখি, তবে রাক্ষসও ছিল একখান
৯। নামাজের আগে সবে করে আহ্বান
১০। এরা ধুয়ে সাফ করে যত পরিধান
১৩। ক্ষেত বটে তবে চাষ হয় শুধু পান
১৫। এই মাপ পাথরের হবে অঙ্গুরী
১৬। বাংলাতে পোকা আর হিন্দিতে ঘুড়ি
১৮। পৃষ্ঠ বা ক্ষেত্রে, দ্বিত্বে কোমলতা
১৯। গোকুলে কৃষ্ণ বেড়ে উঠেছিল হেথা

বৈশাখ সংখ্যার নতুন ধাঁধার বাকি উত্তরদাতাদের নাম

॥ কলকাতা ॥

করবী, পিয়ালী, সুরজিৎ বসাক ও আশিস নন্দী/অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জী লেন; অভীক সেনগুপ্ত/বরানগর; শর্মিলা দে/অমিতা ঘোষ রোড; মালবিকা সাহা, ছায়ারানী সাহা ও গৌরদাস সাহা/ বেহালা; অরুণিমা মণ্ডল ও শীলা মণ্ডল/বেলেঘাটা; রাজীব ও সুব্রত দত্ত/দমদম; কমলিকা লাহা/ক্লার্ক স্ট্রিট; অমৃতা চৌধুরী/পশ্চিম দমদম; সৃজনী মুখার্জী/পার্কসাইড রোড; সোপান রায়/বেনিয়াটোলা স্ট্রিট; মানিক, অরিন্দম ও অর্পিতা/দমদম ক্যান্টনমেন্ট; শৌর্য সাহা/জ্যোতিষ রায় রোড; অর্দিতি দাস/মিত্‌ল্ রোড; অয়ন, অমিতা, শুভ্রা ও অলোক ভট্টাচার্য/নাগেরবাজার; পলিমিতা মিত্র/গোকুল বড়াল স্ট্রিট; টুকাই গুপ্ত/শশীভূষণ দে স্ট্রিট; বুইয়া সোনা মিত্র/গোকুল বড়াল স্ট্রিট; দেবাদিত্য বাইরী/বরাহনগর; সুখেন্দু, শ্রীলেখা, সুদক্ষিণা ও দক্ষিণী ভট্টাচার্য/সুরেন সরকার রোড; গোগল, মালা, রাজা, যীশু, লাবু, মিষ্টি, জয় ও রুমকি/বিজয়গড়; পিল্পু মিত্র/গোকুল বড়াল স্ট্রিট; সৌরভ, সৌনক, রূপা, শঙ্কর, পার্থ, কেয়া ও অলকা/সল্টলেক; তপনকুমার ঘোষ/দমদম; নির্মালা, স্বপ্না, নিরুপম, নীলেন্দু, সৌভিক, অরিজিৎ, নিলয় ও অরুণাংশু/দমদম পার্ক; জয়িতা দত্ত/ব্রিনডিড; কমল, মীরা, রুকু, ফুফু, মুনাল ও মিতিল/কলি-৬; সুজাতা ও অর্পিতা ব্যানার্জী/টালিগঞ্জ; রুমা ভট্টাচার্য/নন্দলাল মিত্র লেন; মধুপর্ণা, জবা, সৌমি, ঐন্দ্রিলা, শান্তনু, অনুরাগ ও অভিনব/যদুনাথ মুখার্জী রোড; সোমা, মান্তু, বুবাই ও বীণা/সিমলা রোড; ইন্দু, পাপান, পিন্টি, রুমা ও ভোলু/নারকেলডাঙা; সানি ও আমিন/তালতলা; অর্ণব রায়/মুদিয়ালি রোড; সায়ন বসু রায়চৌধুরী/সল্টলেক; অভিষেক ও রশ্মি আচার্য, রুশাই, বুবাই ও সুব্রত গোস্বামী/বাগমারি;

॥ হুগলী ॥

দেবাশিস ও স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়/শ্রীরামপুর; মুনাই, মোম, মন্টি, দেবশ্রী, সমি, বুবি ও পুপাই/বৈদ্যবাটী; রনি, পিউ, জুনি, টিটু ও সোমা/রিষড়া; ঈশানদেব, সুনীতি, সুরঞ্জনা ও অশোককুমার মুখার্জী/মাহেশ; রাজা, জেরো, ছোটো, টুকু, ববি, ছোটি, টয়, তুতু, ছুনি, বুবুন ও গবেট/চাতরা; রিমা শর্মা/চুঁচুড়া; মৌ, শুভ, বুবাই, মুনমুন, পিন্টু ও টুটুন/কোন্নগর; সুদীপ্ত, মৌমিতা, লতিকা ও শিশির ধনী/উত্তরপাড়া; ইকবাল, রুনু, ঝুনু ও তামান্না/শেওড়াফুলী; সত্যরঞ্জন, বাচ্চবী, সুজাতা ও শর্মিলা চৌধুরী/মগরা; মা, বাবা, রাজর্ষি ও সত্যর্ষি মুখার্জী/ডানকুনি; স্বাতী ব্যানার্জী/শেওড়াফুলী; মিতালী, মীরা, কণক, পার্থ, পিয়ালী ও অর্ক ব্যানার্জী/চণ্ডীতলা;

বিভাসিতা দত্ত/পল্লীশ্রী, আরামবাগ; সংহিতা রায়/শ্রীরামপুর; আত্রেয়ী, করবী ও অমল রায়/ভদ্রকালী;

॥ বর্ধমান ॥

অনুপ মুখার্জী/আসানসোল; উৎপল, টিঙ্কু, রিম্পি ও বিটু/দুর্গাপুর; অভীক, নবনীতা ও শুভেন্দু ঘাঁটি/মহিশীলা; অর্ঘ, বাবু, বাবলি, বাপ্পা, টুপা, জলি, সঞ্জয়, মৌ, তুম্পা, শেখর, বুলা, সীমা, সাবিত্রী, শক্তি, ঝিন্নি, বাবান, শমীক ও পৌলমী শর্মা/চিত্তরঞ্জন; সৌরভ নিয়োগী/আসানসোল; শমু, নীল্টু ও অপু সরকার/শামারীপুকুর; ছোটমা ও মুনদে/ছোটনীলপুর; স্বাগতা, কুন্তল, রূপশ্রী, সুতপা ও সুনন্দা চ্যাটার্জী ও সুমনা দত্ত/ দুর্গাপুর; নিরঞ্জন, সত্যরঞ্জন, রুবেন, বুবুন ও জয়শ্রী করগুপ্ত/মেমারী; নীলিমা, সোমা ও রমা ভাণ্ডারী/বিদ্যানন্দপুর; রামেশ্বরী, নৃপেন, তারকনাথ, মঞ্জু ও শিবদাস দত্ত/সিঙ্গারকোণ; চৈতালী, মুনী, ছোটি ও রাঙাকাকু/রানিগঞ্জ; পারমিতা ও নবনীতা পুরকাইত/দুর্গাপুর; সুমেধা, ঋতুপর্ণ, দেবশ্রুতি ও সুশ্বেতা/বার্নপুর; প্রণব, পূর্ণেন্দু ও প্রণতি মণ্ডল/দুর্গাপুর; চিত্রলেখা ও সৌম্য সেনগুপ্ত/কুলটি; শুভজিৎ ও শুভদীপ দাস/আসানসোল; বুবাই, রিম্পা, বাবলা, আপ্পা, স্মৃতি ও অমর/দুর্গাপুর; পুকে, চিম্পু, তাতা ও অর্ণব সামন্ত/মেমারি; সীমা, সুকু, কাঞ্চন, সৌরভ ও সুবলসখা কর্মকার/দোমোহানী বাজার; স্বাগতা চৌধুরী/আসানসোল; মহুয়া ও কৌশিক সিনহা/কুলটি; বাবা, মা, রুমকি ও ঝুমকি দে/ইছলাবাদ; চৈতালী ও সৈকত নায়ক/বক্তারনগর; নন্দদুলাল সরকার/কাটোয়া; জয়িতা ও জিতদীপা নায়ক/আসানসোল; মুনাই, মৌ, মিষ্টি, ডিকো, তিতলী, পদ্ম ও বিটুটু/ছোট নীলপুর; কাকু, শিল্পী ও রিমি মিত্র/ছোট নীলপুর; মায়া ও রুমা মণ্ডল/রানিগঞ্জ; শতভিষা, যশোধরা ও ডাঃ উত্তমকুমার বটব্যাল/পাটমোহনা কোলিয়ারী; তিমিরজ্যোতি, মল্লিকা, অনন্যা, গৌতম, দেবজ্যোতি, মঞ্জরী, তারাশঙ্করী, কালু জুলু, পুনপুন ও টুনটুন/কেঁদুড়; তপন, ঈশানী, রানী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী/মিঠাপুকুর কোলিয়ারী; ঋষি, বুয়ান, শ্রী, সু ও সামু/খালুইবিল পাড়া; ম্যাকী, চুকি, বাবিন, খুড়ন্ ও ঘোটু/নিমচাগ্রাম;

॥ বাঁকুড়া ॥

সুবর্ণ, সর্বাণী, স্বাতী ও নির্মল/শেখপুরা হাউসিং এস্টেট; নুপা, মধুছন্দা, শিবেন, শম্পা, ঝন্টু, গুড়িয়া, বুবুল, সুশীল, নারান, বুবাই ও বাপ্পা/মালিয়াড়া; মিল্টন, কল্লোল, পার্থ, মৌসুমী, অষ্টমী, বৈশাখী ও টুসা খাঁ/মনোহর; সুমনা ও কুন্তল বড়ুয়া/কোটজড়িডাঙা; শরকৃষ্ণ, চট্টসূর্য ও প্রতিমা দে/বিষ্ণুপুর; দাদা, বৌদি, মাগু ও সত্যেন চক্রবর্তী/বিশজোড়; মা, বাবা, বাবাই, বাপী, বাচ্চু ও সৈকত/নতুনচটী; শান্তনু, মিঠু ও মুনমুন/সোনামুখী; শর্মিলা, উর্মিলা, মহারাজ, দীপা ও বিশ্বদেব বটব্যাল/ভক্তাবাঁধ; দাদা, বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, জেঠীমা, বড়দি, মেজদি, ছোড়দি, বড়দা, ছোড়দা ও শান্তনু/ভক্তাবাঁধ; বকুল, অনিন্দিতা, প্রেমসুন্দর ও প্রীতিসুন্দর বটব্যাল/ভক্তাবাঁধ; জয়দীপ ও জয়শ্রী রায়/উখড়াডিহি; শ্রাবন্তী, হৈমন্তী ও তিলকসুন্দর বটব্যাল/ভক্তাবাঁধ; লালু, নীলু, শীলু, মিলু ও তিলু/ভক্তাবাঁধ; চৈতালী, মৌটুসী ও মাস্টারমশাই/গোবিন্দনগর হাউসিং; অভিজিৎ ও পূর্ণেন্দু মজুমদার, কৌশিক রায়/প্রতাপবাগান; সন্টু, সীমা, বাবা ও মা/স্কুলডাঙা; বাবা, মা, পাপাই ও রাখী/কেন্দুয়াডিহি; সুদীপ্ত পাল/পাটপুর, আড়াডাঙা; অমিত, জ্যোতির্ময় ও জয়ন্ত সেন/মালিয়াড়া; আশিস গরাই/আড়াডাঙা; সুধাংশু, সুস্মিতা, পম্পা ও স্বরূপ/বেলুট; শান্তনু, শর্মিষ্ঠা, নীলাঞ্জন, রাজু ও রিন্টু/লোকপুর; শান্তনু, মুনমুন ও মিঠু/সোনামুখী;

॥ মেদিনীপুর ॥

বলরাম, শুভ্রা ও শুভায়ু ঘোষ/শরৎপল্লী; সোমা, সাথী, সুনন্দা, দেবযানী ও যশোধরা/গড়বেতা; সুরজিৎ ও সুপর্ণা কোলে/নিমপুরা; বিল্ব মণ্ডল/গড়বেতা; দেবমাল্য ও দেবযানী খুঁটিয়া/ঠাকুরচক; শ্রাবণী ও শ্রেয়সী প্রধান/কেশিয়াড়ি; দিব্যমানিক্য সিংহ/হলদিয়া; পিয়ালী হাজরা/বালিগেড়িয়া; কুহেলি দে, মহাশ্বেতা মাইতি ও স্বর্ণোজ্জ্বল চন্দ/খাজরা; বাপ্পাদিত্য ও শিলাদিত্য আচার্য/কাঁথি; ছাত্রছাত্রীবৃন্দ/দেউড়িবাড় কিরণপ্রভা বিদ্যামন্দির, শুকরুল্লাপুর; সৌরভ, পৌলমী, শিবানী ও শ্রীধর সামন্ত/কাঘুরিয়াবাড়ি; বাবা, মা, সৌমিক ও শৌভিক চৌধুরী/গড়বেতা; শ্রীলেখা, মণিকা, সুপ্তি ও স্বর্ণেন্দু নায়ক/গড়বেতা; সৌম্যজিৎ, সৌরজিৎ ও ফাল্গুনী রায়চৌধুরী, তনুশ্রী মুখার্জী/কোলাঘাট; নিরুপম, শ্রীদেব, স্বপ্ন ও শঙ্খ ভট্টাচার্য/গড়বেতা; বকুল ও সুমন্ত পাল/বকুলকুঞ্জ; প্রণব, নন্দিতা ও অনুমিতা দাশ/কে. টি. পি. পি; জয়িতা ও নন্দিতা সামন্ত/বাজকুল; প্রদ্যোৎ, রাজু, থুনা, মৌ ও পলি/বড়বাড়ি;

॥ পুরুলিয়া ॥

সুমন রক্ষিত, মধুমিতা দত্ত, মানস ও বীথিকা মণ্ডল/রঘুনাথপুর; শান্তনু সরকার/কুষ্ঠ কম্পাউন্ড; কল্পনা, বিকাশ, পলাশ, মিঠু, মৌসুমী ও চুমকি/লাগদা; বহ্নি ও সোনালী ঘোষাল/আদ্রা;

॥ মালদা ॥

মেহজবীন, সুমিতা, সুমনলতা ও তিস্তা/বিবিগ্রাম রোড; নন্দিতা, সুভিনয়, মহুয়া, বুতাই, তুলিকা, সোমা, সেলিম, সুমিতা, সোনা, মিলি, টুকুটুকি, শঙ্কু, লিপিকা, সঞ্জীব, খোকন, অন্তরা, সুদীপ্ত, সীমা ও শক্তি/বিনয় সরকার রোড; শ্যাহরিয়ার, মানু, মাম্পি, পম্পি, মাইফ, ফিরোজ, পাপান ও রুম্পি/রবীন্দ্র এভিনিউ; শুভময় ভট্টাচার্য/পুড়াটুলি; কাজলা, কমল, কল্যাণ ও কল্পনা/খাগড়া;

॥ নদীয়া ॥

বিকাশ গোলদার/দাসদিয়া, ফতেপুর; অনুপম চক্রবর্তী/গুড়িপাড়া; মৃণাল, মৃন্ময় ও মৃদুলকান্তি বিশ্বাস/কৃষ্ণনগর;

॥ উত্তর ২৪ পরগনা ॥

বৈশালী সাহা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, সোদপুর; অনন্যা, কুটুস ও মিতুল সাধুখাঁ/নোনা চন্দনপুকুর; অরিন্দম বসু রায়চৌধুরী/ বসিরহাট; সঙ্গীতা ও শুভব্রত চক্রবর্তী/সোদপুর; পরশ, মামণি, রিপন, চম্পা, বুলটি ও পলাশ/বারাসাত; খোকন, বাপী, ভোলা, রাজা, মালা, বাবাই, মান্টি, সোমা, পাপু ও অনিলাভ পট্টনায়ক/সুখচর; বরুণ, মন্দিরা ও ভাস্কর দাশশর্মা/মণিরামপুর; দিদি, দাদা ও বাবলি দাস/পানশিলা; বিশ্বজিৎ সরকার, দেবশঙ্কর ও রমা প্রামাণিক/রহড়া; তানিয়া ও অতসী/বারাসাত;

॥ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ॥

কমলিকা ও ঈশিতা সরকার/রাজপুর; প্রলয়শঙ্কর ঘোষ/সোনারপুর; কৌশিক, মিলি ও পারমিতা/সরিষা; সুকান্ত, অমিত, শিপ্রা ও সুদীপ্ত/রায়পুর; সংযুক্তা ও সংহিতা রায়/শম্পা মির্জানগর; পারমিতা ও পারিজাত চক্রবর্তী/কোদালিয়া; সোমা, তনিমা ও তন্ময় দত্ত/যোতশিবরামপুর;

॥ বিহার ॥

টুটু, বুচু, সৌমেন, মা ও বাবা/ জামশেদপুর; মিমো, চাঁদা, বুবাই, নূপুর ও পাপা/জামশেদপুর; গৌরীনাথ, কান্তিকুমারী, রুণা, সোনা ও সোমা ঘোষাল/চাস মেন রোড; অমিত ও অরিন্দম সুরাল/ডি. বি. এস. সিটি; সন্দীপ, মধু, মলয়, সমর, ধীমান ও হীরাভাই/ জামশেদপুর; শান্তনু, সীমা, বুল্টি, কুল্টি ও পিন্ট সেন/জামশেদপুর; মা, বাবা, দাদু, কৌশিক ও সৌমিক আশ/ধানবাদ;

॥ অসম ॥

সমরকুমার দে/টিহু রেল কলোনী; অদিতি, সুস্মিতা ও খোকন কাকু/গুয়াহাটি; সৌম্য, জয়দীপ ও পাপু/গুয়াহাটি;

॥ গুজরাট ॥

অনামিকা ও সুব্রত ঘোষ/ও. এন. জি. সি. কলোনী, বরোদা।

আভারানী গুহঠাকুরতা
স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার
প্রথম পুরস্কৃত গল্প

ডাকাতের হাতে

এলা নাগ

তোমাদের যেমন মা আছে, আমারও সেই রকম মা ছিল। হ্যাঁ ছিল, এখন আর নেই। আমি এখন মা-হারা। মায়ের বয়স কত ছিল তা আমি ঠিক জানি না। তবে আকৃতি ছিল বিশাল। হাজারো ডালপালা মেলে বেশ কিছুটা জায়গা ছায়া করে রাখত। কত রকমের পাখি বাসা বেঁধে থাকত আমার মায়ের বাহুমূলে। ভোরবেলা তাদের কিচিরমিচির আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙত। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে সরু পায়ে-চলা পথটা গেছে, তারই ধারে আমার মা স্নিগ্ধ ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে থাকত। আর আমি মার থেকে হাত দশেক দূরে। জঙ্গলের ঐ পায়ে-চলা পথ দিয়ে দুপুরবেলা যখন গ্রামের লোকজন যেত কিংবা গ্রামের ছেলে-মেয়েরা যখন কাঠ কুড়াতে এসে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত তখন আমার মা তার স্নিগ্ধ ছায়া ও মৃদুমন্দ বাতাসে তাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিত। আমিও মার ছায়াতেই বড় হচ্ছিলাম। কখনও রৌদ্রের প্রখরতা মা আমার গায়ে লাগতে দেয়নি। কালবৈশাখীর দিনে যখন প্রবল ঝড় উঠত, তখন মা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখত। বেশ আনন্দেই কাটছিল আমাদের দিনগুলো। হঠাৎ এলো সেই বিভীষিকাময় রাত।

তখন রাত কত হবে তা ঠিক জানি না, বেশ কিছু মানুষের পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমার। দেখি মাও জেগে গেছে। প্রথমটা ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না কি ব্যাপার। তবে কি ডাকাত-দল গ্রামে ডাকাতি করতে যাচ্ছে? কাছে আসতে দেখলাম হ্যাঁ, ডাকাত-দলই বটে। জঙ্গল-ডাকাত। প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক আছে দলটাতে। সকলেরই হাতে কুড়ুল করাতের মতো মারাত্মক সব অস্ত্র। দেখে তো আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বড় বড় গাছগুলিকে আক্রমণ করল। আমার মাও বাদ গেল না। মায়ের আর্তনাদ সারা জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম, আমার মাকে ছেড়ে দাও, তোমরা আমার মাকে মেরো না। কিন্তু আমার ভাষা কেউ বুঝতে পারল না। আমি তো তোমাদের মতো চলতে ফিরতে পারি না, তাই ছুটে গিয়ে কারুর সাহায্যও চাইতে পারলাম না। নিমেষের মধ্যে মা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ভোরের আলো ফোটার আগেই গাড়ি এলো। অন্য সকলের সঙ্গে আমার মায়ের সেই খণ্ডবিখণ্ড দেহ তারা তুলে নিল গাড়িতে। সমস্ত হাহাকার ও আর্তিকে পেছনে ফেলে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল গাড়ি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি একা এই বিশাল জঙ্গলে। একদিন হয়তো এই পরিণতি আমারও হবে। তোমরা, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষরা কি পার না আমাদের এই জঙ্গল-ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচাতে?

আভারানী গুহঠাকুরতা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার
দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

কুড়ানির মা

সুলক্ষণা রায়

পড়ার ঘরে খুব মন দিয়ে আগামী দিনের পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। দরজায় ছায়া পড়তে মুখ তুলে দেখি বিমলাদি এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বাড়ি নিয়ে বিমলাদি সকালে প্রায় পাঁচ-ছটা বাড়িতে কাজ করে। একদণ্ড দাঁড়াবার বা কথা বলার ফুরসৎ থাকে না ওর। ঝড়ের মতো কাজ সেরে মেয়েকে নিয়ে ও অন্য বাড়িতে চলে যায়।

দেব সাহিত্য কুটীরের
পূজাবার্ষিকী
ছোটদের
গল্প সঞ্চয়ন
ষাট বছর
পর আবার
বই মেলায় বেরিয়েছে।

লেখক তালিকায় আছেনঃ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, জলধর সেন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রিয়ম্বদা দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুখলতা রাও, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবিনয় রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রাধারাণী দেবী, সুনির্মল বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, হেমেন্দ্রলাল রায় এবং আরো অনেকে।
ছবি এঁকেছেনঃ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইবন্ধু রায় ও ফণিভূষণ গুপ্ত।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ,
২১,ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

পরিষ্কার কাজ আর ব্যবহারের জন্য বাড়ির সকলেই ওকে পছন্দ করে। এ হেন ব্যস্ত বিমলাদিকে আমার পড়ার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে একটু অবাক হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার বিমলাদি, কিছু বলবে?'

আমার প্রশ্নে বিমলাদি বেশ সঙ্কোচ বোধ করল মনে হলো। আঁচলে মুখের ঘাম মুছে কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'দিদিমণি, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। যদি কিছু মনে না কর—'

মনে মনে অবাক হলেও মুখে হাসি এনে বললাম, 'এতে লজ্জা পাবার কি আছে বিমলাদি। তুমি কি জন্য এসেছ বল।'

বিমলাদি বলল, 'দিদিমণি, এ বছর আমার মেয়েটা ছ বছরে পড়ল। স্কুলে ভর্তি হবে। মাস্টার রেখে পড়িয়েছি। শুনেছি ভর্তি হবার সময় নাকি খুব শক্ত পরীক্ষা হয়। তুমি যদি মেয়েটাকে একটু দেখে দাও—'

'ও এই ব্যাপার। ঠিক আছে। তুমি প্রতিদিন সকালে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি দেখে দেব।'

খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল বিমলাদি, 'তোমাকে কি বলে যে আশীর্বাদ করব দিদিমণি—'

হেসে বললাম, 'আগে তোমার মেয়ে ভর্তি হোক, তারপর আশীর্বাদ।'

পরের দিন বিমলাদি মেয়ে নিয়ে এলো। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি। আগেও দেখেছি, এবার ভাল করে দেখলাম। কাছে টেনে আদর করলাম। 'কি নাম তোমার?' মেয়েটির চটপট উত্তর, 'কুড়ানি—'

'কেন, এ রকম নাম কেন?' জিজ্ঞাসু চোখে বিমলাদির দিকে তাকাতে বিমলাদি বলল, 'ওর ভাল নামও আছে দিদিমণি—অন্নপূর্ণা।'

'বাঃ, সুন্দর নাম। তা, এই কুড়ানি নামটা দিতে গেলে কেন? অন্নপূর্ণার ডাক নাম তো অনু হওয়া উচিত।'

মেয়েকে খেলতে পাঠিয়ে দিয়ে বিমলাদি আমার সামনে মেঝেতে বসে পড়ল। বলল, 'তোমাকে মিথ্যা বলব না দিদিমণি, ওকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সেই থেকে ও আমার কাছেই আছে।'

পৃথিবীতে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে। আমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে বিমলাদি বলল, 'ওই এখন আঁমার ধ্যানজ্ঞান দিদিমণি। ওকে আমি খুব ভাল করে মানুষ করতে চাই। তুমি যদি একটু সাহায্য কর—'

আমি আগেই জানিয়েছিলাম, দেখব। সব শোনার পর আমার দেখব জিদটা আরও বেড়ে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম যেমন করেই হোক ভর্তির পরীক্ষায় ওর নামটি সকলের আগে রাখতে হবে। বুদ্ধিমতী চটপটে অন্নপূর্ণা অনেক কিছুই আগে শিখে ফেলেছিল। তবুও এ্যাডমিশন টেস্টের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরগুলো শেখাতে লাগলাম।

যেদিন স্কুলে সফল ছাত্রদের নামের লিস্ট টাঙাবার কথা সেদিন সবার আগে আমিই ছুটে গিয়েছিলাম দেখতে। যেন পরীক্ষাটা আমার। লিস্ট দেখে আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম। সবার আগে অন্নপূর্ণার নাম।

বাড়ি এসে দেখলাম অন্নপূর্ণা বসে রয়েছে। আদর করে কোলে তুলে নিয়ে বললাম, 'ভর্তির পরীক্ষায় তুমি প্রথম হয়েছ। বল তো সব থেকে বেশি কে খুশি হবেন?'

এক গাল হেসে অন্নপূর্ণা বলল, 'আমার মা। যাই মাকে খবর দিয়ে আসি।'

কোল থেকে নেমে সে ছুটল মাকে খবর দিতে।

ছবি: সুফি

এঁদের লেখাও ভালোঃ

প্রিয়রঞ্জন সাহা (সিউড়ি, বীরভূম)॥ সুজয় দেবনাথ (গুয়াহাটি, অসম)॥ মৌ দাস (দমদম, কলকাতা-৩০)॥ তৃষ্ণা রায়চৌধুরী (গুপ্তিপাড়া, হুগলি)॥ তনয়কুমার নাগ (পাইকপাড়া, কলকাতা-৩৭)॥ অভিজিৎ বেরা (কাঁথি, মেদিনীপুর)॥ সব্যসাচী রায় (মধুতটী, পুরুলিয়া)॥ শচীন্দ্রনাথ দে (কনকাসাই, মেদিনীপুর)॥

ঘোষণা

আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের সত্ত্বাধিকারী সঞ্জয় সাহা তাঁর প্রয়াত পিতা নির্মল সাহার স্মরণে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো নির্মল সাহা সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু

ভাই-এর কপালে দিলাম ফোঁটা

৺নির্মল সাহা

জন্ম—৩ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৪৬

মৃত্যু—১৬ ভাদ্র শনিবার ১৩৮৫

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ অগ্রহায়ণ। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার ফাল্গুন সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কার — ১০০ টাকা   দ্বিতীয় পুরস্কার — ৫০ টাকা

সৌজন্যেঃ আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়

(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) গড়িয়াহাট জংশন

১৬১ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

কলকাতা-৭০০০১৯

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

স্বামী মুক্তিকামানন্দ

জাহাজে ৫৫ দিন

(৩১ মে থেকে, ২৫ জুলাই ১৮৯৩)

স্বামীজী জাহাজে উঠেই বুঝলেন সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মুখোমুখি হয়েছেন। জাহাজে স্বদেশী লোক নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ যাত্রী বিদেশী। তার ওপর ভক্তদের দেওয়া একগাদা বাক্স-প্যাঁটরা সামলাতে গলদঘর্ম অবস্থা। দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী কোনোদিন নিজের জিনিসপত্রের দিকে নজরও দেননি। এখন যে এ সবই তাঁকে একলা সামলাতে হবে! মহা ঝঞ্ঝাট! সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন, তবুও স্বামীজীর প্রাণে বল, মনে উৎসাহ—এই ভেবে যে তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়েছেন, তাঁকে তাঁর কাজ করতে হবে। ভারতের পথে প্রান্তরে ঘুরতে ঘুরতেই তিনি মৃতপ্রায় স্বজাতিকে পূর্ণশক্তিতে জাগিয়ে তোলার উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই বাইরে যতই অসহায় ভাব দেখান মন তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ে ভরা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একখণ্ড কাগজে লিখে দিয়েছিলেন 'নরেন্দ্র শিক্ষা দেবে, যখন ঘরে বাইরে হাঁক দেবে।' শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক রূপ : শ্রীমা সারদা চিঠিতে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে সমস্ত ভক্তগোষ্ঠীর আন্তরিক শুভেচ্ছা তো আছেই। সুতরাং তাঁর কাছে ঐ সব ছোটখাট অসুবিধা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার।

সদা সজাগ মন-বুদ্ধি দিয়ে স্বামীজী নতুন মানুষজন, নতুন খাদ্য-অভ্যাস, আদব-কায়দা রপ্ত করে নিলেন অতি অল্প সময়ে। তাঁর ভদ্র ব্যবহার, শিশুর মতো সারল্য অনেকের চিত্ত জয় করে নিল। ক্যাপটেন সাহেব নিজে এগিয়ে এসে স্বামীজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন। উৎসুক স্বামীজীকে এঞ্জিন ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন কেমন করে বয়লারে বাষ্প তৈরি হয়, তারপর সেই বাষ্পের চাপে কেমন করে প্রপেলার ঘুরিয়ে জল কেটে কেটে জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জাহাজের মাথায় ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়ে দূরবীন চোখে লাগিয়ে স্বামীজী সমুদ্রের মাঝে মাঝে দ্বীপগুলি চিনে নিতে থাকলেন।

কলম্বো

জাহাজ বোম্বাই ছেড়ে এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বো পৌঁছে গেল। সারাদিন বন্দরে থাকতে হবে শুনে স্বামীজী জাহাজ থেকে নেমে গাড়ি ভাড়া করে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লেন। খুঁজে খুঁজে তিনি বুদ্ধ-ভগবানের একটি মন্দির আবিষ্কার করলেন। সেখানে দেখলেন বুদ্ধদেবের শায়িত মূর্তি। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু তাঁরা কেবল সিংহলী ভাষা জানেন আর স্বামীজী ও ভাষা জানেন না। তাই তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হলো না। স্বামীজী জানতেন কলম্বো থেকে আশি মাইল দূরের কাণ্ডি শহর বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র। সময়ের অভাবে সেখানেও যাওয়া হলো না। অতটুকু সময়ের মধ্যেই কিন্তু স্বামীজী সিংহলীদের খাবার, পোশাক-আসাক ও ভাষা সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে পেরেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন মাদ্রাজীদের সঙ্গে সিংহলীদের বেশ কিছুটা মিল আছে।

মালয়

কলম্বো থেকে জাহাজ বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে মালয়ের অন্তর্গত পিনাং শহরে এসে থামল। ছোট দ্বীপ হলেও সুন্দর করে সাজানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অধিবাসীরা বেশির ভাগই মুসলমান। তবে চীন ও ভারতবর্ষের লোকও যে যার মতো

বসবাস করছে।

সিঙ্গাপুর

পিনাং-এর পর সিঙ্গাপুর যেতে যেতে দূরবীন দিয়ে ক্যাপ্টেন স্বামীজীকে সুমাত্রা দ্বীপগুলোও দেখিয়ে দিলেন। ছোট একটি দ্বীপ হলেও সিঙ্গাপুর পূর্ব-পশ্চিমের সুন্দর সংযোগস্থল। বন্দর-প্রধান শহর। সব দেশের বেশির ভাগ পণ্য এই বন্দর দিয়ে যাতায়াত করে। কঠিন শাসনব্যবস্থায় সব কিছু ঝকঝকে তকতকে। বাড়ির নর্দমায় একটা পাতা জমে থাকলেও পরিবেশ-দূষণ ইন্সপেক্টর এসে ধমক দিয়ে যাবে। নাগরিক কর্তব্যে বিন্দুমাত্র অবহেলা দেখলেই অপরাধীকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হয় এবং এইভাবেই সবাইকে ভয় দেখিয়ে সিধে রেখেছেন শহর কর্তৃপক্ষ। স্বামীজী জাহাজ থেকে নেমে শহর ঘুরতে ছাড়লেন না। সিঙ্গাপুরে চীন দেশের লোক প্রচুর এবং তারা বেশ অবস্থাপন্ন।

হংকং

এরপর জাহাজ হংকং দ্বীপে নোঙর ফেলল। হংকং ইংরেজের শাসন থেকে তখন মুক্ত হতে চলেছে। অধিবাসীরা প্রায় সবাই চীন দেশের লোক। সিঙ্গাপুরে স্বামীজী চীনাদের চাল-চলন খাওয়া-দাওয়া দেখে নিয়েছিলেন। চীন-সভ্যতার কথা তাঁর বিশদ পড়াও ছিল। হংকং-এ এসে দেখলেন খেটে খাওয়া চীনাদের কঠিন জীবনসংগ্রাম। জাহাজ কিনারায় নোঙর করতেই শত শত চীনা নৌকো যাত্রীদের ডাঙায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে জাহাজ ঘিরে ধরল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকোতেই বসবাস করে। মাঝির স্ত্রী পিঠের ঝোলায় ছেলে বেঁধে নিয়ে এক হাতে হাল ধরে এক হাত আর এক পা দিয়ে বনবন করে দাঁড় বাইছে। চীনে-খোকা নিরাসক্তভাবে ঝুলে আছে মায়ের পিঠে। আর মা কখনো দ্রুত নৌকো চালাচ্ছে, কখনো ভারী ভারী বোঝা ঠেলছে, আবার কখনো অদ্ভুত তৎপরতায় এক নৌকো থেকে অন্য নৌকোয় লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়চ্ছে। ভিড়-ভাট্টায় যে কোনো সময় চীনে খোকার মাথাটা কিছুতে লেগে থেঁতলে যেতে পারে। তা সেদিকে মা বা ছেলের কারুরই ভ্রুক্ষেপ নেই। পাগলের মতো ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে বাচ্চার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে দু-এক খানা চালের পিঠে। দেখতে দেখতে স্বামীজীর মনে হচ্ছিল চীন ও ভারতবর্ষের অগ্রগতি যে আটকে গিয়ে স্থির মমিতে পরিণত হয়েছে তা যেন ঐ চীনা বাচ্চাটির দার্শনিক-সুলভ ভাবভঙ্গিতে ধরা পড়েছে সুস্পষ্টভাবে। তিনি বুঝতে পারলেন একটি মহান জাতির এমন দুরবস্থার একমাত্র কারণ দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব। চীন ও ভারতের অধিকাংশ সাধারণ মানুষকেই প্রতিদিনের খাওয়া-পরা ও মাথা গোঁজার একটুখানি জায়গার জন্য এত পরিশ্রম করতে হয় যে অন্য কিছু ভাববার অবসরই মেলে না।

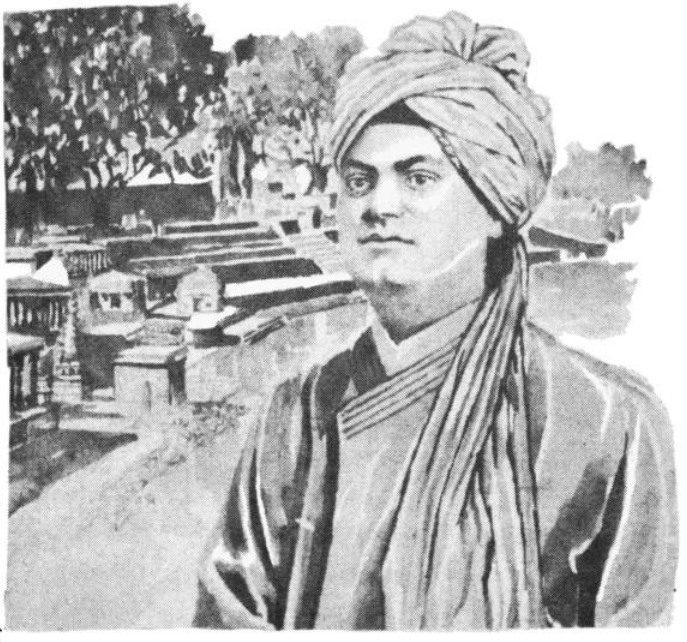

ক্যান্টন ঘুরে আসা

হংকং বন্দরে তিন দিন জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। সুযোগ পেয়ে একদিন বিকেলে অন্য একটা জাহাজে চড়ে ক্যান্টন শহর দেখতে গিয়েছিলেন স্বামীজী। দেখলেন, সেখানে হাজার হাজার নৌকো রয়েছে। কোনোটা দোতলা, কোনোটা তেতলা। সবগুলিই বসবাসের উপযোগী। এক একটি তো সুন্দর বড় হোটেলের মতো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। আরো হাজার হাজার নৌকো মাল ও যাত্রী নিয়ে ভিড় লাগিয়েছে। অগণিত মানুষ জীবনযুদ্ধে একজন আর একজনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে—সবাই জয়ী হওয়ার চেষ্টা করছে আপ্রাণ।

চীনা বৌদ্ধমন্দিরে কাঠে খোদাই বুদ্ধের শিষ্যদের মুখে স্বামীজী বাঙালীদের মুখের আদল খুঁজে পেয়েছিলেন। সারা পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অবদানের কথা জানা ছিল ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক স্বামী বিবেকানন্দের। জ্ঞানের সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিলেন ক্যান্টনের বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে।

খাঁটি চীনা মন্দির দর্শন

এবার একটা মজার কথা বলি। শুধু মজাই নয় স্বামীজী কত নির্ভীক ও নিজের ধর্মের উপর কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার পরিচয়ও পাওয়া যায় এই ঘটনা থেকে। স্বামীজীর একবার তীব্র ইচ্ছা হলো খাঁটি চীনা মন্দির দেখবেন। দোভাষীকে এ কথা বলাতে সে বলল, সে-সব মন্দির এমন জায়গায় যেখানে বিদেশীদের যাওয়া নিষেধ। দোভাষীর কথা শুনে স্বামীজীর

কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। এমন মন্দির তো দেখতেই হবে। তাছাড়া তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এমন একটি মন্দিরের পুরোহিত যদি কোনো রকমে জানতে পারেন, একজন হিন্দু সন্ন্যাসী এসেছেন মন্দির দেখতে, তাহলে কিছুতেই ঢুকতে দিতে আপত্তি করবেন না; বরং হয়তো সম্মানই দেখাবেন।

এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে দোভাষীকে ও কয়েকজন জার্মান সহযাত্রীকে পীড়াপীড়ি করে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। মঠের কাছাকাছি এসে দোভাষী হঠাৎ চিৎকার করে উঠল 'পালান পালান' বলে। অর্থাৎ পুরোহিতরা বেজায় চটে গেছে, মারবে বলে তেড়ে আসছে। দেখা গেল দু-তিনজন লোক লাঠি হাতে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ছুটে আসছে। দোভাষীকে কোনোরকমে আটকে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে বাপু, যাওয়ার আগে বলে যাও তোমাদের ভাষায় হিন্দু যোগীকে কী বলে। তারপর সবাই পালিয়ে গেলেও স্বামীজী ধীরস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর তিনি যে হিন্দু যোগী তা জানিয়ে দিলেন। জাদুমন্ত্রের মতো ফল হলো। ক্রুদ্ধ পুরোহিতরা শ্রদ্ধাসহকারে অনেক কাকুতিমিনতি করতে থাকল। তাদের কথার মধ্যে থেকে স্বামীজী একটি শব্দ বুঝলেন 'কবচ'। তিনি তখন চিৎকার করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পুরোহিত কী বলতে চাইছেন?' দোভাষী প্রাণভয়ে দূর থেকে জানিয়ে দিল, 'মশায় এরা ভূতপ্রেত থেকে বাঁচবার জন্যে রক্ষাকবচ চাইছে, এরা আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছে।' স্বামীজী আবার সিদ্ধাই-এর প্রতি অতি বিরূপ। একটা মতলব ঠাওরালেন তিনি। পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে টুকরো টুকরো করে প্রত্যেকটিতে হিন্দুদের পবিত্র শব্দ 'ওঁ' সংস্কৃত অক্ষরে লিখে তাদের হাতে হাতে বিলিয়ে দিলেন। তারা ওগুলি কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে তাঁকে ভক্তিভরে মঠের ভেতরে নিয়ে গেল, একেবারে নিভৃত ঘরে হাতে লেখা গোপন পুঁথি-পত্র দেখাল—সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লিখিত।

জাপান-নাগাসাকি

হংকং থেকে জাহাজ ভাসল জাপানের দিকে। জাপানে পৌঁছে প্রথমে নাগাসাকি বন্দরে থামল কয়েক ঘণ্টার জন্যে। এত অল্প সময় হাতে পেয়েও গাড়ি করে শহর বেড়িয়ে নিলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। চওড়া-সিধে রাস্তাঘাট দেখে মুগ্ধ হলেন স্বামীজী। চিড়গাছের সবুজপাতায় ঢাকা ছোট ছোট বাড়িগুলোর সামনে পেছনে সুন্দর বাগান। সব মিলিয়ে ছবির মতো। সেখানকার মানুষের সৌন্দর্যচর্চার আগ্রহ তাঁকে খুবই আনন্দ দিয়েছিল। বনসাই জাপানীদের খুব প্রিয় শখ। শুধু গাছপালার ক্ষেত্রেই নয় প্রকৃতির সব কিছুরই ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি তৈরি করতে এরা খুব ভালবাসে। ছোট ছোট বটগাছ, ছোট ছোট কৃত্রিম ঝর্ণা, পাথরে বাঁধান ছোট্ট সাঁকো তাদের বাগানের শোভা বৃদ্ধি করে।

কোবি

নাগাসাকি থেকে জাহাজ পৌঁছল কোবি বন্দরে। স্বামীজী কয়েক ঘণ্টায় জাপান দেখে এত বিস্মিত মুগ্ধ হলেন যে জাপানের মাঝখানে কলকারখানার শহরও দেখবেন ঠিক করে জাহাজ ছেড়ে দিলেন। কোবি থেকে ইয়োকোহামা গেলেন স্থলপথে। তারপর জাপানের আরও তিনটি শহর দেখলেন—ওসাকা, কিয়োটো ও টোকিও।

ওসাকাতে নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। কিয়োটো জাপানের প্রাচীন রাজধানী আর বর্তমান রাজধানী টোকিও। আজ থেকে ১০০ বছর আগে জাপান দেখে স্বামীজীর ধারণা হয়েছিল জাপানীরা সম্পূর্ণ জেগে উঠেছে। বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তা সঠিকভাবে বুঝেছে। তাদের কারখানাগুলো ছবির মতো সাজান, সুন্দর। শ্রমজীবীরা এসব নিজের বাড়ির মতোই আপন মনে করে। সেখানেই তাদের সমাজবন্ধন-আনন্দ-আহ্লাদ। সব সামাজিক উৎসবই কারখানাকে ঘিরে কোম্পানির লোকেদের সঙ্গে। এশিয়ারই একটা দেশ জাপান অথচ ভারতের তুলনায় কত উন্নত। জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সুরুচিসম্পন্ন নরনারী ও আধুনিক শিল্পের আয়োজন সবটাই স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। নিজের দেশের উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর জাপানীদের ভাব তাঁর নিজের দেশে কবে আসবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন স্বামীজী। তাই সবাইকে ডাক দিয়েছিলেন জাপান দেখে যাওয়ার জন্যে। ইউরোপের সভ্যতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার চেয়ে জাপানের উন্নতির রহস্য অনুধাবন করা এবং তেমনভাবে ভারতবর্ষের লোকেদের অনুপ্রাণিত করা সহজ বলে স্বামীজী মনে করতেন।

ইয়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুবর

১৪ জুলাই ইয়োকোহামা থেকে স্বামীজী ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রুটের "এম্প্রেস্ অফ ইন্ডিয়া" নামক জাহাজে চড়ে বসলেন। কানাডার বন্দরে নেমে রেলগাড়ি করে যাবেন আমেরিকার চিকাগো শহরে। এই জাহাজে জাপান থেকে দুজন ভারতীয় যাত্রী পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন জামসেদজী নসরভনজী টাটা (টাটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা)। এ সময় স্বামীজীর গরম কাপড় বেশি না থাকায় খুব কষ্ট হয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশে গ্রীষ্মকালেও শীত থাকে, জুলাই মাসে তো খুবই শীত। তাই শুধু জাহাজে নয় কানাডা ও আমেরিকাতে নেমেই শীতের প্রকোপে কষ্ট পেয়েছিলেন খুব।

২৫ জুলাই, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় স্বামীজী পা রাখলেন নূতন ভূখণ্ডে, ভ্যাঙ্কুবর দ্বীপে।

কুলজিতের অসাধারণ গোল

এখন শুধু খেলা আর খেলা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পুজো হয়ে গেছে। বিল্টু-মন্টুদের মনটন খারাপ। স্কুলে ছুটি। পড়ারও তেমন চাপ নেই। ব্যাটবল নিয়ে ওরা পাড়ার গলিতে নেমে পড়েছে। বিকেলবেলায় অবশ্য পার্কে গিয়ে খেলে। আসলে ওদের মন ভালো নেই। এখনো লীগের খেলা শেষ হলো না। লীগের খেলা না হলে কি ফুটবল জমে? মাদ্রাজে সিজার্স কাপের ফাইনালে বিজয়ন আর ক্রিস্টোফার গোল করেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। একটা গোল অবশ্য সঞ্জয় মাঝি শোধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই খেলার পর থেকে নস্টে-ভস্টেরা চেঁচাচ্ছে—এই হারের বদলা আমরা লীগে নেবো। সেখানে আর মোহনবাগানকে জিততে হচ্ছে না।

'সোনা'র হাসি ব্রিটেনের কলিন জ্যাকসনের

আকিল আনসারি

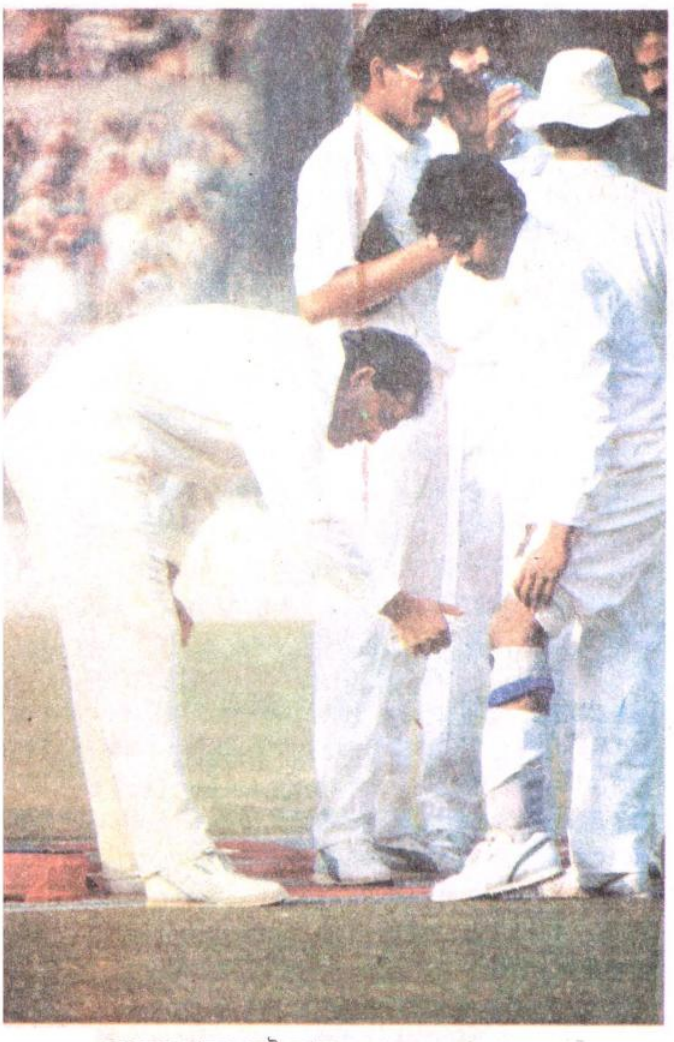

আমরের পায়ের চোট দেখছেন আজহার

সে সব অবশ্য অনেকদিন আগের কথা। এখন তো দুম-দাম বাজি পুড়ছে। বাড়িতে শঙ্করকাকু তুবড়ি বানাবার তোড়জোড় করছেন। ওদিকে যে শরৎকাল শেষ হয়ে শীত পড়ি পড়ি করছে সে খেয়াল কারো নেই। তাই তো বিল্টু-মন্টুরা ব্যাটবল নিয়ে গলিতে নেমে পড়েছে। ভারত-পাকিস্তানের জোর লড়াই চলছে। কপিলদেব বিশ্বরেকর্ড গড়লেন বলে। এবার ভারতে সংক্ষিপ্ত সফরে পাকিস্তান আর নিউজিল্যান্ডের আসার কথা। তখন কপিল পৌঁছুবেন তাঁর লক্ষ্যে। ভেঙে দেবেন স্যার রিচার্ড হ্যাডলির টেস্ট ক্রিকেটে সব থেকে বেশি ৪৩১টি উইকেট দখলের নজির। সুনীল গাভাসকার দেশের মাটিতে বিশ্বের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে দশ হাজার রান করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এবার সম্ভবত কপিলদেবও দেশের মাটিতে আর এক বিশ্বরেকর্ড গড়ার কৃতিত্ব দেখাবেন। সকলে ভেবেছিলেন কপিল শ্রীলঙ্কায় গিয়ে বাজিমাৎ করবেন। প্রয়োজনীয় উইকেটগুলি পকেটে পুরে গুঁড়িয়ে দেবেন স্যার হ্যাডলিকে। কিন্তু তা আর হলো কই! তার ওপর টেস্ট ক্রিকেটে ভারত সহজেই শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে রাবার জিতলেও একদিনের ক্রিকেটে কিন্তু উল্টে গেছে ফলটা। তার জন্যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরাই দায়ী। দু দলের প্রথম একদিনের ম্যাচে ভারত কোনোক্রমে জিতেছিলো। দ্বিতীয়টিতেও ভারতের জেতার কথা। কিন্তু জেতা ম্যাচ ভারতকে হারতে হয়েছিলো ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বহীন মনোভাবের জন্য। আর তৃতীয় একদিনের ম্যাচটিতে তো ভারতকে টেক্কা দিয়ে শ্রীলঙ্কা তুড়ি মেরে জিতে গিয়েছিলো।

আসলে একদিনের ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা সত্যিই দুর্দান্ত দল। তারা যে বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খুব একটা সুবিধে করতে পারে না তা শুধু তাদের অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যে। পরবর্তী বিশ্বকাপের আসর ভারত, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কায় বসবে। শ্রীলঙ্কার বেশি খেলা নিশ্চয়ই তাদের দেশেই পড়বে। তখন হয়তো তারা সকলকে চমকে দিতে পারবে। সে প্রতিযোগিতার অনেক আগেই সি. এ. বি-র জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মিনি বিশ্বকাপের আসর বসছে। খেলা হবে সারা ভারতের মাঠে মাঠে। সেমিফাইনাল আর ফাইনাল ম্যাচ অবশ্য কলকাতাতেই হবে। বিশ্বকাপের আঁচ

শচীন তেন্ডুলকার

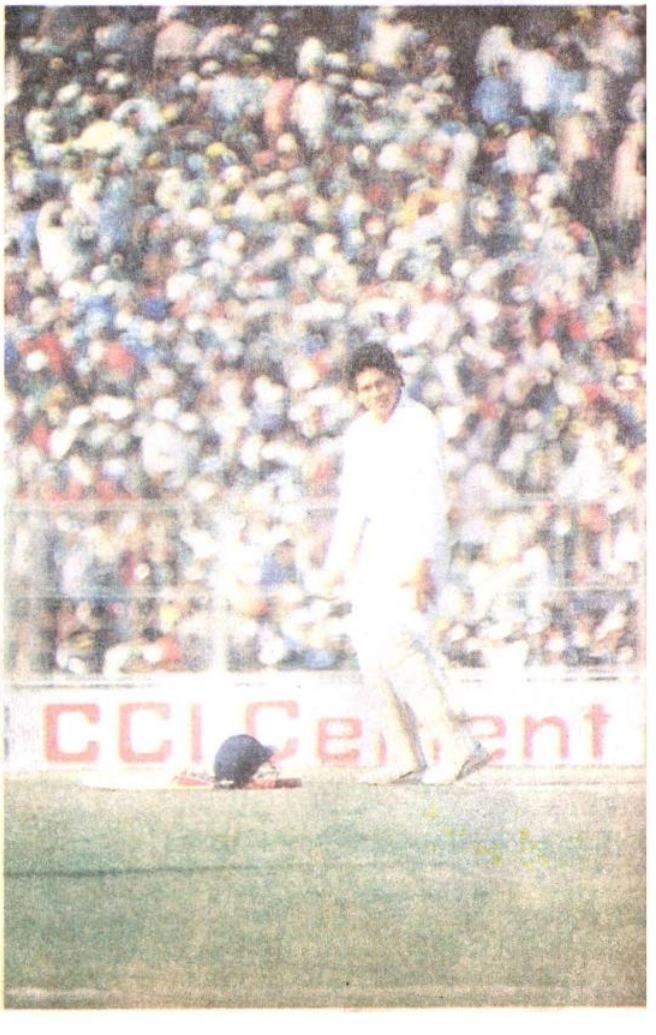

ঐ প্রতিযোগিতাতেই পাওয়া যাবে।

বিশ্বকাপের প্রসঙ্গে ফুটবলের কথাও এসে যায়। আসছে বছর আমেরিকায় বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। সেই খেলা দেখার প্রায় সব টিকিটই ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু স্পনসররা একটা ব্যাপারে বড় চিন্তায় পড়েছেন। সম্প্রতি আমেরিকায় ইউ. এস. কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে গেলো। বিশ্বের সেরা দলগুলো সেই প্রতিযোগিতায় খেলেছিলো। কিন্তু মার্কিন দর্শকদের তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। ইউ. এস. ওপন ফুটবল প্রতিযোগিতার বদলে দর্শকরা অনেক বেশি সংখ্যায় ছুটেছিলেন বাস্কেট আর বেসবল প্রতিযোগিতার খেলা দেখতে। দর্শকদের এই মনোভাব দেখে স্পনসররা চিন্তায় পড়েছেন। তবে তাঁদের চিন্তার বিশেষ কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। কারণ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আলাদা গুরুত্ব, আলাদা মর্যাদা।

ওদিকে জাপান উঠেপড়ে লেগেছে ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দায়িত্ব পাবার জন্যে। জাপানে ফুটবল খেলা

বিনোদ কাম্বলি

বাবু কপিল

জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে লিনেকার, জিকোর মতো নামকরা খেলোয়াড়দের তারা নিয়ে গেছে। ফলও পাওয়া গেছে হাতে নাতে। দর্শকরা এখন ফুটবলের দিকে ঝুঁকছেন। জাপানের ক্লাবগুলো এখন তাই চাইছে কোনোভাবে মারাদোনাকে আনতে। মারাদোনা এলে জাপানের ফুটবল রমরম করে চলবে। ওদিকে ফিফার সভাপতি জো হ্যাভেলাঞ্জকে জাপানে এনে সেখানকার সুযোগ-সুবিধাগুলো দেখানো হয়েছে। একটা ব্যাপারে হ্যাভেলাঞ্জ সাহেব দারুণ খুশি। তিনি দেখেছেন জাপান বিশ্বকাপের দায়িত্ব পেলে যে ১৮টি শহরে খেলা হবে তার প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির এক্সপ্রেস ট্রেন সার্ভিস আছে। এতে খেলোয়াড় আর সাংবাদিকদের ভীষণ সুবিধা হবে। প্লেন ধরার জন্যে অযথা সময় নষ্ট হবে না। জাপানের অন্যসব সুযোগ-সুবিধের তো তুলনাই নেই। তাই হ্যাভেলাঞ্জ সাহেব চাইছেন জাপানকে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দায়িত্ব দিতে। হ্যাভেলাঞ্জ সাহেব যখন পেছনে আছেন তখন জাপানের ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দায়িত্ব পেতে

নেটে শ্রীনাথ বল করছেন। দেখছেন ওয়াদেকার। সামনে দাঁড়িয়ে চৌহান।

মনে হয় খুব একটা অসুবিধে হবে না।

বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে আমরা যতোই মাতামাতি করি না কেন ভারতের তো খেলার কোনো চান্স নেই। এক যদি জাপানের মতো ভারত কোনোদিন বিশ্বকাপের আয়োজন করার ব্যাপারে এগিয়ে যেতে পারে আর সত্যি সত্যিই দায়িত্ব পেয়ে যায় তাহলে আলাদা কথা। কারণ উদ্যোক্তা দেশকে বিশ্বকাপে খেলার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হয় না। তারা সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়ে যায়। ভারতকে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে হলে তাই প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক দায়িত্ব নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাও কিন্তু বড় ঝামেলার ব্যাপার। মুশকিলটা তো সেইখানেই।

খবর-টবর

এক লাফে

মাইক পাওলের নাম মনে আছে ? হ্যাঁ লং জাম্পে বব বিমোনের ৮·৯০ মিটারের বিশ্ব রেকর্ড পাওয়েল ভেঙে দিয়েছিলেন ১৯৯১ সালে টোকিওর বিশ্ব অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশিপে। সেখানে পাওয়েল লাফিয়েছিলেন ৮·৯৫ মিটার। বিমোন রেকর্ড গড়েছিলেন সেই ১৯৬৮ সালে। পাওয়েল বলেছেন, তিনি এই বছরের মধ্যেই ৯ মিটারের ব্যবধান ভাঙবেন। এক সময় মনে হতো বব বিমোনের রেকর্ড কেউ কোনোদিন ভাঙতে পারবেন না। বিমোনও তাই বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি এতদিন পাওয়েলকে পাত্তাই দেননি। অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। পাওয়েল কিন্তু বিমোনকে পুজো করতেন। বিমোনের ঐ ব্যবহারে বড় দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি। সেই দুঃখই পাওয়েলের জেদ বাড়িয়ে দেয়। তিনি জান-প্রাণ লড়িয়ে চেষ্টা করছিলেন আরো উন্নতি করতে, বব বিমোনের দীর্ঘদিনের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দিতে। শেষ পর্যন্ত তাই তিনি দিয়েছেন। আর এবার চেষ্টা করছেন ৯ মিটারের ব্যবধান ঘোচাতে। দেখা যাক তিনি সফল হন কিনা।

ভগবানের হাত

ভগবানের হাত বা হ্যান্ডস অফ গড কথাটা নিশ্চয়ই মনে আছে। সেই যে বিশ্বকাপে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে মারাদোনা লাফিয়ে উঠে হেড দেবার বদলে হাত দিয়ে গোল করেছিলেন তারপর বলেছিলেন আমি নই গোলটা করিয়েছে ভগবানের হাত! পেলে তো ঐ দৃশ্য দেখে একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিলেন, মারাদোনাকে ঠগ, জোচ্চর আরো কতো কী বলেছিলেন। সে অবশ্য অনেকদিন আগের কথা। এখন কিন্তু পেলে বলছেন তাঁর হাত দুটো ভগবানের হাত, বিশেষ করে ছোটদের কাছে। ঐ হাত দিয়ে অনেক অসুস্থকে তিনি সুস্থ করে তুলেছেন। যে একদম হাঁটতে পারতো না তাঁর হাতের স্পর্শে সে এখন হাঁটছে। যে ব্যথায় হাত নাড়তে পারছিল না, তিনি হাত বুলিয়ে দেবার পর সে এখন দিব্যি হাত নাড়ছে। এ ছাড়াও অনেক দুরারোগ্য রোগ তাঁর হাতের স্পর্শে সেরে যাচ্ছে। তাই পেলে বলেছেন, তাঁর হাত দুটো এখন ভগবানের হাত। ঐ হাতের স্পর্শে ছোটরা ভালো হয়ে যাচ্ছে যে!

মারাদোনার ইচ্ছা

দিয়েগো মারাদোনা আবার খেলতে চান। সেভিল থেকে বেরিয়ে গিয়ে মারাদোনা এখন আর্জেনটিনায় নিজের বাড়িতে আছেন। সম্প্রতি মারাদোনা বাবার সঙ্গে বসে আর্জেনটিনার একটা খেলা দেখছিলেন। খেলা দেখতে দেখতেই তিনি আবার মাঠে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বাবারও তাই মত। ৩৩ বছরের মারাদোনা বলেছেন, তাঁর ওজন কিলো চারেক বেড়ে গেছে। সেটা এখনই কমিয়ে ফেলতে হবে। মারাদোনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কোন ক্লাবে খেলবেন? মারাদোনা হেসে বলেছিলেন, ব্যাপারটা এখন গোপনই থাক। আমার ম্যানেজার এই বিষয়ে কয়েকটি ক্লাবের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। দেখা যাক কোন ক্লাবের সঙ্গে ফাইনাল হয়।

ভারতীয় খানা

বিদেশীদের কাছে ভারতীয় খানার দারুণ কদর। স্টেফি গ্রাফ তো ভারতীয় খাবার বলতে অজ্ঞান। স্টেফি বলেছেন, ভারতীয় রেস্তোরাঁ দেখলেই তিনি সেখানে ঢুকে পড়েন। তাঁর দু চারজন ভারতীয় বন্ধুও আছে। মার্টিনা নাভ্রাতিলোভারও ভারতীয় খাবার ভীষণ পছন্দ। আমেরিকার ভারতীয় রেস্টুরেন্টগুলোয় তাঁকে প্রায়ই ঢুঁ মারতে দেখা যায়। মার্টিনার এক ভারতীয় বন্ধু একবার তাঁকে বলেছিলেন, ভারতীয় খাবার খেতে যখন অতো ভালোবাসেন তখন একবার ভারতে চলুন না। খোদ ভারতে বসে প্রাণভরে ভারতীয় খানা খাবেন, সেই সঙ্গে খেলা-টেলাও হবে। তাজমহল-টহলও দেখা হবে। শুনে আঁতকে উঠেছিলেন মার্টিনা। বলেছিলেন, রক্ষে করুন। ঐ গরমের দেশে গিয়ে মরি আর কি! স্টেফিরও সেই মত!

রাইকার্ড রয়ে গেলেন

হল্যান্ডের মাঝ মাঠের ডাকসাইটে ফুটবল খেলোয়াড় ফ্রাঙ্ক রাইকার্ড আরো এক বছর এ. সি. মিলানে খেলবেন। ১৯৮৮ সালে স্বদেশের দুই খেলোয়াড় রুদ গুলিট আর মার্কো ভ্যান বাস্তেনের সঙ্গে রাইকার্ড এ. সি. মিলানে এসেছিলেন। এঁদের দৌলতে এ. সি. মিলান দুর্ধর্ষ দল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে রাইকার্ড বলেছিলেন, আমি আর আগের মতো খেলতে পারছি না। যে ক্লাব আমাকে মান, সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি এবং অর্থ দিয়েছে সেই ক্লাবে থাকবো অথচ ভালো খেলতে পারবো না এ কথা আমি ভাবতেই পারি না। তাই সসম্মানে ক্লাব ছেড়ে যেতে চাই। কথা কানে যেতেই নড়ে বসেন এ. সি. মিলানের কর্তারা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা রাইকার্ডকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আরো একটা বছর অন্তত খেলার ব্যাপারটা পাকা করে ফেলেন। শুধু রাইকার্ড নন, মার্কো ভ্যান বাস্তেনের সঙ্গেও এ. সি. মিলানের আরো একবছর খেলার চুক্তি হয়ে গেছে। রাইকার্ডের সঙ্গে এ. সি. মিলানের ৪.৫ মিলিয়ান ডলারের চুক্তি।

গল্প নয় সত্যি

ছোট্ট একটি ছেলে!

তার দু চোখে তখন অনেক স্বপ্ন। বাবা-মা তাঁকে ভীষণ ভালোবাসেন। তাঁদের আদরে ছেলেটি একটু একটু করে বড় হচ্ছে। হঠাৎ সেই সুখের সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। এক পথদুর্ঘটনায় ছেলেটির বাবা মারা গেলেন। ছোট্ট পরিবারটির ওপর এ ছিলো বিনা মেঘে বজ্রপাত। কোনো পুঁজি নেই। লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেটিকে মানুষ করার সামর্থ্য নেই। অসহায় ভদ্রমহিলা আর কোনো পথ নেই দেখে অন্যের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ নিলেন। দুজনের পেট তাতেই চলে যাবে। মা সক্কালবেলায় রান্না করতে চলে যান। ছেলেটি আর কি করে। সে তখন পাড়ার ছোট ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলায় মেতে ওঠে। পড়াশুনো নেই দিনরাত শুধু খেলা আর খেলা।

কেরলে তখন সেভেন-এ-সাইড ফুটবল প্রতিযোগিতা খুবই জনপ্রিয়। ছেলেটি বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে সেই প্রতিযোগিতায় খেলতে লাগলো। খেলার জন্যে দুচার টাকা করে পেতেও লাগলো। সেই টাকার পুরোটাই সে তুলে দিতো মায়ের হাতে। সেইরকমই একটি প্রতিযোগিতায় খেলার সময় ছেলেটির ওপর চোখ পড়লো কেরলের নামকরা কোচ চাটুন্নির। খেলা দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, ছেলেটির মধ্যে সম্ভাবনা আছে। তিনি আর দেরি না করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। শেখাতে লাগলেন খেলা। ছেলেটিও মন-প্রাণ দিয়ে ফুটবল খেলা শিখতে লাগলো। চেষ্টা ছিলো বলে খুব তাড়াতাড়ি সে উন্নতি করতে লাগলো। আর খুব অল্প দিনের মধ্যেই নাম করে ফেললো। প্রথমে জুনিয়ার পরে কেরলের জাতীয় দলে চান্স পেয়ে গেলো। ঘুচলো তার মায়ের দুঃখ। খেলার দৌলতে মোটা মাইনের চাকরি পেলো। টাকাও পেতে লাগলো অনেক।

কে সেই খেলোয়াড়টি?

সেই খেলোয়াড়টি আজ ভারতের সবচেয়ে দামী খেলোয়াড়। এবার কলকাতায় খেলছে। মোহনবাগানের সব থেকে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। প্রত্যেকটা ম্যাচে গোলের পর গোল করছে। এরপরও কি তার নাম বলে দিতে হবে। হ্যাঁ, সেই ছোট্ট মালয়ালি ছেলেটিই আজকের বিজয়ন!!

তোমাদের জিজ্ঞাসা

প্রণব মণ্ডল (বসিরহাট, উত্তর ২৪-পরগনা)
প্রশ্নঃ বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান কে?
উত্তরঃ আমাদের মতে শচীন তেন্ডুলকার।

অরিজিৎ ভট্টাচার্য (শ্রীরামপুর, হুগলি)
প্রশ্নঃ লিয়েন্ডার পেজের বাড়ির ঠিকানা জানতে চাই।
উত্তরঃ লিয়েন্ডার পেজ, c/o ক্যালকাটা সাউথ ক্লাব, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-১৫ —এই ঠিকানায় চিঠি লিখলেই লিয়েন্ডার পেয়ে যাবেন।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জি (c/o বিষ্ণুপদ চ্যাটার্জি, পোঃ ও গ্রাম—বড়জোড়া, বাঁকুড়া)
প্রশ্নঃ অ্যালান নট ও সৈয়দ কিরমানি—এই দুই উইকেট-কিপারের মধ্যে সেরা কে?
উত্তরঃ অ্যালান নট।

সুমিতা ঘোষ (c/o কার্তিকচন্দ্র ঘোষ, পোঃ লিডু, জেলা তিনসুকিয়া, অসম)
প্রশ্নঃ সুনীল গাভাসকার কোন দেশের বিরুদ্ধে তাঁর জীবনের প্রথম সেঞ্চুরিটি করেন।
উত্তরঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

দেবাশিস পাল (c/o ডাঃ মানব পাল, রাইফেল ক্লাব (ইস্ট), বাঁশদ্রোনি, কলকাতা-৭০০ ০৭০)
প্রশ্নঃ পাতৌদি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ক'টা সেঞ্চুরি ও কটা হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। ভিভ রিচার্ডসের বড় ছবি চাই।
উত্তরঃ পাতৌদির সময়ে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ শুরুই হয়নি। ভিভ রিচার্ডসের বড় ছবি তো শুকতারায় অনেকবার ছাপা হয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন ঃ

(১) দশ (১০) নম্বর জার্সির কথা বললে সবার মনে পড়বে পেলের কথা। কিন্তু কলকাতার ফুটবলে বাইশ (২২) নম্বর জার্সিটা কে নিজের করে নিয়েছিলেন?

(২) আমাদের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে দিতেই হবে। কারণ আজ আমরা সর্বহারা। আমাদের কিছুই নেই। কোন দেশ এ কথা বলেছিলো?

(৩) ভারতের কোন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়কে 'দ্য রিটার্নিং মেশিন' বলা হতো?

(৪) এবারের লিপটন চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন স্যাঞ্চেজ। ফাইনালে কাকে হারিয়ে তিনি ঐ খেতাব জিতেছেন?

(৫) একই ওলিম্পিকে কোন অ্যাথলিট পর পর তিনটি দূরপাল্লার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন? তিনি কে? কোন সালে?

(৬) ক'জন ভারতীয় বোলার এক ইনিংসে ৯টি উইকেট দখল করেছেন। তাঁদের নাম কি? কোন দেশের বিরুদ্ধে তাঁরা এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন?

(৭) বিশ্বের কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রথম নাইটহুড পান?

(৮) বিশ্বের প্রথম টেস্ট ম্যাচটি কোথায় হয়েছিলো? কোন সালে?

উত্তর ঃ

(১) শ্যাম থাপা।

(২) চিলি। ১৯৬০ সালে এই দেশ বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো ভয়ঙ্করভাবে। সেখান থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যে তারা বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চেয়েছিলো দেশের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করবে বলে।

(৩) দীনেশ খান্নাকে।

(৪) স্টেফি গ্রাফকে।

(৫) চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেক। ১৯৫২ সালে।

(৬) দুজন। জেসু প্যাটেল আর সুভাষ গুপ্তে। প্যাটেল ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কানপুরে এবং সুভাষ গুপ্তে ১৯৫৮-৫৯ সালে ঐ কানপুরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঐ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

(৭) ডন ব্রাডম্যান।

(৮) মেলবোর্নে। ১৮৭৭ সালে।

অনিবার্য কারণবশত বিলির বুট এই সংখ্যায় দেওয়া গেল না।
সঃ শুকতারা

প্রকাশিত হলো
পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত
নতুন সংস্করণ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে
ক্রিকেট খেলার আইন কানুন
ফুটবল খেলার আইন কানুন
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বেস্ট সেলার
খেলার রাজা ফুটবল
বাদশা গোলাম
আমাদের সেরা খেলোয়াড়
আমাদের মতো খেলো
মারাদোনা-মারাদোনা
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ক্রিকেটের বই
শীতের দুপুরে দুই প্রতিবেশী
ব্যাটের রাজা গাভাসকার
ক্যারিবিয়ানের কড়চা
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কলমে দুই ক্লাব
ক্লাবের নাম মোহনবাগান
ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল

যে কোনো বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে। ঘরে বসে পেতে হলে নিচের ঠিকানায় চিঠি লিখুন।

RBC ADVTG/DSK/6

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

উক্তি

অর্জুন রণতুঙ্গে

আমাদের ভিডিও ক্যাসেটে ধরা আছে মনোজ প্রভাকর নখ দিয়ে বলের চামড়া তুলছেন। আমরা হৈচৈ করতে পারতাম। করিনি নেহাত ভদ্রতার খাতিরে।

—অর্জুন রণতুঙ্গ

(ভারত-শ্রীলঙ্কার তৃতীয় টেস্টের পর)

কে বললো আমি নখ দিয়ে চামড়া তুলছিলাম? বলে মাটি লেগেছিলো। তাই খুঁটে দিচ্ছিলাম আমি।

—মনোজ প্রভাকর

(অভিযোগের উত্তরে)

এবার আমি রেহাই চাই। ভারতীয় দলের ম্যানেজারি করতে গিয়ে আমার অফিসের কাজে বড্ড ক্ষতি হচ্ছে। অফিসের কাজেও যে আমি সবচেয়ে ওপরে উঠতে চাই।

—অজিত ওয়াদেকার

(শ্রীলঙ্কা থেকে ফিরে)

অজিত ওয়াদেকার ক্রিকেট নিয়ে এতো ভাবনা-চিন্তা করেন, আমাদের কথা সব সময় তাঁর মাথায় থাকে, প্রায় সব সময়ই তিনি আমাদের কাছাকাছি থাকেন, উপদেশ যেমন দেন, বকেনও তেমনি। তবে তার চেয়ে অনেক বেশি বোধহয় ভালোবাসেন আমাদের। আর কোনো ক্রিকেট ম্যানেজারের কাছ থেকে এই রকম ব্যবহার পাইনি।

—মহম্মদ আজহারউদ্দিন

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অজিত ওয়াদেকারের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে)

আজহার

রমেশ কৃষ্ণণ

ডেভিস কাপ থেকে ভারতীয় টেনিস সংস্থা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করবে কিন্তু খেলোয়াড়রা তাদের প্রাপ্য পাবে না—এ কখনো চলতে পারে? কখনোই না।

—রমেশ কৃষ্ণণ

(ডেভিস কাপে খেলার জন্যে খেলোয়াড়দের টাকা দেবার বিতর্ক প্রসঙ্গে)

আই. এফ. এ.র শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গ হিসেবেই কি কলকাতার ঘরোয়া ফুটবল লীগের খেলা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হবে?

—প্রসূন ব্যানার্জি

(সম্প্রতি একটি লেখায়)

প্রসূন ব্যানার্জি

আমি লাস ভেগাসে থাকতে পছন্দ করি কেন জানো? আমি এমন জায়গায় থাকতে চাই যেখানে দরকার হলে রাত দুটোর সময়ও আমি একটা হেয়ার ড্রায়ার কিনতে পারি।

—আন্দ্রে আগাসি

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে)

শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

পড়ার সঙ্গে খেলা

বীরু বসু

তোমরা পাঠক-পাঠিকারা এতদিন শুকতারা পড়ে বহু বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে জেনেছ। তোমরা জেনেছ কিভাবে ছেলেমেয়েরা পড়ার সঙ্গে খেলাতে সাফল্য পাচ্ছে। অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন জাগে শিক্ষাকেন্দ্রে খেলাধূলার চর্চা কতটুকু সম্ভব? কিন্তু তোমরা যারা নিয়মিত শুকতারা পড় তারা নিশ্চয় স্বীকার করবে যে ধৈর্য, চেষ্টা ও আন্তরিকতা থাকলে যে কোনো অসাধ্য সাধন করা যায়। তার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিবেশের। আর সে পরিবেশই হলো বিদ্যালয়।

আজ তোমাদের এমন একটি বিদ্যালয়ের কথা বলব যেটার নাম শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, কিন্তু সবাই চেনে আকুনা স্কুল নামে। এটি দীর্ঘ ছাপ্পান্ন বছর ধরে শ্রীরামপুর বটতলার দক্ষিণপ্রান্তে দণ্ডায়মান। বিদ্যালয়টির তিনটি ব্লকই লাল রঙের। দেখলে মনে হয় যেন কলকাতা শহরের লালবাড়ি। বিদ্যালয়টি গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রয়াত সত্যরঞ্জন দাস ও জিতেন্দ্র লাহিড়ীর অবদান অপরিশোধ্য। বর্তমানে এখানে বারশো ছাত্রী ও পঞ্চাশ জন শিক্ষয়িত্রী রয়েছেন।

পড়াশোনায় ছাত্রীরা সকলেই বেশ মনোযোগী ও ঋজু মনোভাবাপন্ন। পাশের হার প্রতি বছরই খুব ভাল। এমন কথাই জানালেন বিদ্যালয়ের সিস্টার ইনচার্জ অনিতা ভড়।

শিক্ষিকারা মনে করেন পড়াশোনার মতো খেলাধূলাতেও মেয়েরা সাফল্যলাভ করতে পারে। শুধু চাই আন্তরিকতা ও একাগ্রতা। দুই ক্রীড়া শিক্ষিকা উষারানী দাস ও মাধবী মুখার্জি প্রতিভা গড়তে মেয়েদের পিছনে যথেষ্ট সময় দিচ্ছেন। টিফিন আওয়ার্সে তাঁরা বিদ্যালয়ের পিছনের মাঠটিতে ছাত্রীদের অ্যাথলেটিক্স, খো-খো, কবাডি ও অন্যান্য খেলায় তালিম দিচ্ছেন। তাঁদের শিক্ষা পেয়েই সর্বাণী দাস, লোপামুদ্রা সিনহা, সংঘমিত্রা সিনহা, অনসূয়া কুমার, কস্তুরী ভট্টাচার্য, সময়িতা ব্যানার্জি, শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জি, শর্মিলা ব্যানার্জি ও চন্দ্রিমা সরকার ১০০ মিটার ২০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, খো-খো, টেবিল টেনিস ও যোগাসনে নজর কাড়া কৃতিত্ব অর্জন করে চলেছে। খেলা নিয়ে মেতে থাকলেও সকলেই বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী। খেলাধূলায় এই বিদ্যালয়টির হুগলি জেলায় বেশ সুনাম রয়েছে।

ক্রীড়া শিক্ষিকা মাধবী মুখার্জি মনে করেন শুধু খেলায় বা পড়ায় নয় তাৎক্ষণিক বক্তৃতা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও মেয়েদের পারদর্শিতার পরিচয় মেলে। সাংস্কৃতিক শিক্ষয়িত্রী দীপ্তি গুপ্ত ও সুনন্দা মজুমদার আশা করেন আগামী দিনে বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী লোপামুদ্রা সিনহা, মোহর ব্যানার্জি ও শ্রাবন্তী ঘোষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের রাজ্যস্তরে মেলে ধরবে।

এত কিছু থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিকাদের একটাই দুঃখ আর্থিক কারণে বছর চারেক হলো বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে পুরস্কার পাওয়া থেকে ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। সহানুভূতি স্বরূপ যদি রাজ্য ক্রীড়াদপ্তর থেকে স্বল্প অনুদান পান, তবে আগামী বছরের ক্রীড়ানুষ্ঠানেই পাঁচ বছরের পুরস্কার মেয়েদের হাতে তুলে দেবেন বলে আশা রাখেন প্রধানশিক্ষিকা অনিতা ভড়।

শিক্ষিকা মায়া ঘোষ ও বীথি কুলবীরের কাছে জানতে চেয়েছিলাম বিদ্যালয়টির এত নামডাক কেন। তাঁরা বললেন, বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলাই নাকি একমাত্র কারণ। উঠে আসার সময় বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রীটির নাম জানতে পারলাম, শ্রাবন্তী ঘোষ। শ্রাবন্তী শুধু পড়া বা খেলায় নয় আচার-আচরণেও বিদ্যালয়ের গোল্ডেন গার্ল।

ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত আপনার

সরল অভিধান

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত, পরিশোধিত এবং পরিবর্ধিত)

সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে

দেব সাহিত্যের অনবদ্য সংকলন

অরুণ দের

হাসির হুল্লোড়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

দুরন্ত এক অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী

সাহারার সন্ত্রাস

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

আকর্ণ ধনুরাসন

আজকে যে ব্যায়ামটি শেখাবো তার নাম আকর্ণ ধনুরাসন। এই আসনটি করলে শরীরের অনেক রোগ সেরে যায় আর নিয়মিত অভ্যাস করলে অসুখ-বিসুখ শরীরের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। যদিও অতীত দিনের যুদ্ধাস্ত্রের অনুসরণে এই আসনটির নামকরণ হয়েছে কিন্তু এখানে যুদ্ধ ব্যাধির বিরুদ্ধে। প্রথমতঃ আসনটি কোমরের অতিরিক্তি মেদ কমাবে, কাঁধ-হাত ও কোমরের বাতজনিত ব্যথা-বেদনা দূর করবে। এ ছাড়া যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রাশয়, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে যন্ত্রগুলি সুস্থ সবল রাখবে। তোমার মনের চঞ্চলতাও দূর করতে পারবে যদি আসনটি করবার সময় নিজের ছড়ানো পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে চেয়ে থাকতে পারো।

প্রথমে দু'পা সামনে ছড়িয়ে বসে বাঁ হাত দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ধরতে হবে। এবার ডান হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল বা সব আঙুলগুলিকে ধরে, বাঁ পাটিকে হাঁটু থেকে ভাঁজ করে বাঁ হাতের নিচে দিয়ে টেনে তুলতে হবে ডান কানের কাছে, ঠিক ছবির মেয়েটির মতো। খেয়াল রাখবে মাটিতে ছড়ানো ডান পা যেন ভাঁজ না হয়ে যায়। তবে প্রথম প্রথম ভাঁজ হলে ক্ষতি নেই। এই অবস্থানে ১৫/২০ সেকেন্ড থাকো বা ১৫/২০ বার স্বাভাবিক ভাবে দম নেওয়া ছাড়া কর। একদিকে করে হাত ও পা পাল্টে বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাঁ কানের কাছে পাটিকে টেনে তুলে নিয়ে যাও এবং থাকো আগের মাত্রাতেই। দু'দিক মিলে একবার হলো। পরে শবাসনে শুয়ে বিশ্রাম নাও ১০/১৫ সেকেন্ড।

নিউ বেঙ্গলের অভিজাত অভিধান

আবার পাওয়া যাচ্ছে

Subal Chandra Mitra's

Dictionaries for Students and Teachers

An ideal book for learning and writinggood English

The Student's Constant Companion Price Rs. 80.00

Pocket Bengali to English Dictionary

সরল বাংলা অভিধান মূল্য— টাঃ ২৪০·০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

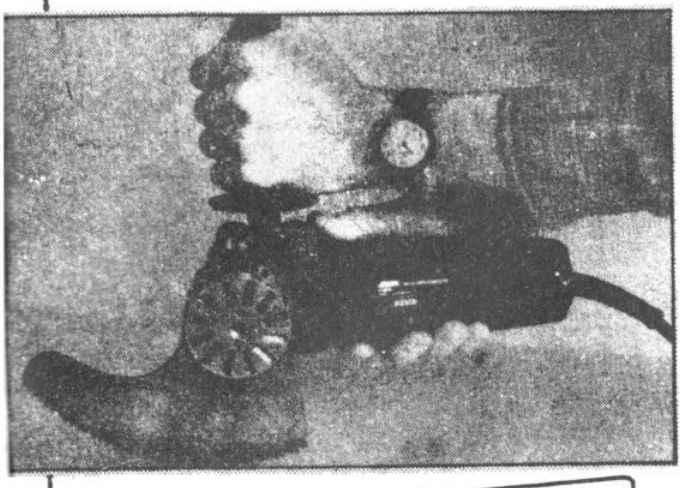

কাঠ কাটে, হাত কাটে না

পার্থের বিজ্ঞানী কেভিন ইংকস্টার তৈরি করেছেন এক বিস্ময়কর করাত। বিদ্যুৎচালিত এই করাত ইঁট, কাঠ ইত্যাদি যে কোনো শক্ত জিনিস চোখের পলকে দু টুকরো করে ফেলে। কিন্তু আঙুল বা হাতের উপর দিয়ে করাত চালালে সামান্য আঁচড়ও কাটে না। তার মানে এই করাত থেকে দুর্ঘটনার কোনো ভয় নেই। করাত চালানোর জন্য দস্তানা পরারও প্রয়োজন নেই। জোড়া ব্লেড দেওয়া এই করাত একসঙ্গে দুটো জিনিসকে টুকরো করতে পারে। করাতটির নাম দেওয়া হয়েছে অল-স (All-Saw)।

আবিষ্কারক

ফিল্টার কথাটার সঙ্গে তোমরা সবাই পরিচিত। অনেকেই তো প্রত্যেকদিন ওয়াটার ফিল্টারের জল খাও। সেই ফিল্টারে থাকে একটা কি দুটো পোর্সেলিনের ক্যান্ডেল। এই ক্যান্ডেলগুলো জলের সঙ্গে মিশে থাকা বড় বড় দূষণকারী কণাগুলোকে আটকে দেয়। আটকে দেয় বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ধাতুকণা। কিন্তু আণুবীক্ষণিক কোনো কণা বা জীবাণু এই ফিল্টার ক্যান্ডেলগুলো আটকাতে পারে না। যেমনটি পারত না আগেকার দিনের বহুল প্রচলিত ফিল্টার—সেই তিনটে হাঁড়ি যার উপরেরটিতে থাকত কাঠকয়লার গুঁড়ো, মাঝেরটিতে বালি এবং নিচে জমা হতো পরিশ্রুত জল। ফিল্টার করা জল যদি ফোটানো না হয় তবে তার থেকেও যে কোনো জলবাহিত রোগ হতে পারে। যেমন কিছুদিন আগে জলবাহিত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আন্ত্রিক রোগে বহু লোক মারা গেলেন। দূষিত জলপানই তাঁদের মৃত্যুর কারণ। এসব কথা ভেবেই তোমাদের মতো একদল পড়ুয়া একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে। এই আবিষ্কারকরা সবাই ইংল্যান্ডের বাথ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্র। তারা আবিষ্কার করেছে মলিকুলার ফিল্টার বা আণবিক ফিল্টার। কোনো যৌগের ক্ষুদ্রতম কণাকেই বলে অণু। আবার একই মৌলের একাধিক পরমাণু যুক্ত হয়ে গঠন করে মৌলিক অণু। এই অণুগুলি আকারে খুবই ছোট। জীবাণুরাও আকারে খুব ছোট। সাধারণ কোনো ফিল্টার দিয়ে এদের ছাঁকা যেত না বা আলাদা করে ফেলা যেত না। কিন্তু মলিকুলার ফিল্টার এদের আলাদা করে একেবারে দূষণমুক্ত বিশুদ্ধ পরিশ্রুত জল তৈরি করতে পারে।

টীকা তৈরি হয় জীবাণু থেকেই। এতদিন পর্যন্ত জীবাণুদের আলাদা করে বাছার জন্য খরচ হতো খুব বেশি। এই ফিল্টারে সহজেই জীবাণুকে আলাদা করা যায়। ফলে এখন সহজেই বিশুদ্ধ প্রতিষেধক টীকা কম খরচে তৈরি করা যাবে।

এভাবেই রক্তের রক্তরস বা প্লাজমা থেকে প্রোটিন বা প্লাজমা প্রোটিন তৈরি করা যাবে, যেটি বিভিন্ন সময়ে অসুস্থদের প্রাণ বাঁচানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে। তৈরি করা যাবে পেপটাইড জাতীয় বিভিন্ন উৎসেচক বা জারক রস, বিভিন্ন হরমোন। শুধু তাই নয়, এগুলো সহজলভ্য ও দামে সস্তা হবে। এই আবিষ্কারকে কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বলা যায়।

সত্যি !

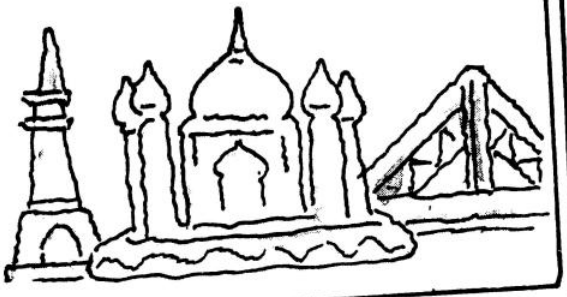

অভিনব মডেল

ব্যাঙ্গালোরের নীলগিরি বেকারি ১৯৭০ সালে একটি প্রদর্শনী চালু করে। প্রতি বছর এই প্রদর্শনীটি হয় আর এখানে হরেক রকমের কেক সাজানো থাকে দর্শকদের দেখার ও কেনার জন্য। তবে যে জিনিসটি দেখতে সবাই ভিড় করেন সেটি কেকের তৈরি কোনো বিখ্যাত সৌধের মডেল। যেমন তাজমহল, ব্যাঙ্গালোরের বিধান সৌধ বা অন্য কিছু। ১৯৯১-এর প্রদর্শনীতে তাঁরা চিনি দিয়ে লন্ডন ব্রিজের যে মডেলটি বানান সেটি লম্বায় ছিল ৮.৪২ মিটার, চওড়ায় ২ মিটার আর উচ্চতায় ৩ মিটার। এতদিন তাঁরা যে কটি মডেল তৈরি করেছেন এটি ছিল তার মধ্যে সব থেকে বড়। মডেলটি তৈরি করতে লেগেছিল ৪৫০ কেজি চিনি। সাত জন লোক দুমাসের ওপর খেটে এটি গড়ে তোলেন।

রোলার স্কেটে ভারতনাট্যম

দশ বছরের জি. কৃষ্ণা শ্বেতার শখ আবার অন্যরকম। ছোট্ট থেকে পায়ে রোলার স্কেট বেঁধে সে নেচে আসছে। নাচের মধ্যে আবার ভারতনাট্যম আর কুচিপুড়ি তার বিশেষ প্রিয়। কৃষ্ণা নিয়মিত দর্শকের সামনে নাচে। বিশাখাপত্তনমে ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে সে এক সাড়া-জাগানো প্রোগ্রাম করে। অবশ্যই রোলার স্কেটে ভারতনাট্যম আর কুচিপুড়ির।

নাম কত লম্বা হয়

কর্নাটকের মান্ত্যয় থাকেন এম. এস. এস. আর. সি. ভি. এল. এন. এস. এস. চক্রবর্তী। পুরো নাম লিখলে দাঁড়ায় মুক্কাপতি সোমা সীতা রাম চন্দ্র ভেঙ্কট লক্ষ্মী নরসিংহ সত্য সাই চক্রবর্তী। আদ্যক্ষর সমেত পদবীটুকু লিখতেই লাগে ইংরাজীর ২১টি হরফ আর পুরো নাম লিখলে তো কথাই নেই, একেবারে সাতের পিঠে এক ৭১। চক্রবর্তী মশাইকে চিঠি দিতে হলে পোস্টকার্ড বা ইনল্যান্ডে কুলোনো বেশ শক্ত। দরকার বড় মাপের খাম।

রোরুদ্যমান ম্যাডোনা

উনিশ শ' তিপ্পান্ন সালে ইটালিতে অ্যান্টোনিয়েটা আর অ্যাঞ্জেলো আয়েননুসোর বিয়ে হয়। বিয়ে উপলক্ষে তারা ম্যাডোনার একটা ছোট মূর্তি উপহার পায়। মূর্তিটা তেমন কিছু মূল্যবান ছিল না। সিসিলির কারখানায় তৈরি প্লাস্টার অব প্যারিসের এরকম হাজারো মূর্তি বাজারে তিন আমেরিকান ডলারে পাওয়া যেত। কিন্তু ম্যাডোনার মূর্তি বলে তাদের কাছে এর মূল্য ছিল অনেক।

বিয়ের কিছুদিন পর অ্যান্টোনিয়েটার মাথায় থেকে থেকে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। দৃষ্টিশক্তিও মাঝে মাঝে সে হারাতে থাকে। একদিন এই রকম অসুস্থতার মধ্যে ম্যাডোনার দিকে চোখ পড়তে অ্যান্টোনিয়েটা দেখে ম্যাডোনার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। সে চিৎকার করে ওঠে, 'ম্যাডোনা কাঁদছে।' চেঁচামেচি শুনে তার মা আর বৌদি ছুটে আসে। তারাও ওই একই দৃশ্য দেখে। আশ্চর্যর ব্যাপার এই ঘটনার পর থেকেই অ্যান্টোনিয়েটা সুস্থ হয়ে ওঠে।

ম্যাডোনার অশ্রুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় উপচে পড়ে অ্যান্টোনিয়েটাদের বাড়িতে। মূর্তিটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে ভালো করে মুছে দেবার পরও মূর্তির চোখে আবার অশ্রু দেখা দেয়। পরে যখন পুলিশের সদরদপ্তরে মূর্তিটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন যে অফিসারটি মূর্তিটা নিয়ে যায় তার ইউনিফর্মও মূর্তির চোখের জলে ভিজে যায়। কেমিক্যাল পরীক্ষা করে দেখা যায় ম্যাডোনার অশ্রু মানুষের অশ্রুর মতোই। এই অশ্রুতে কাপড় ভিজিয়ে কোনো রোগীকে ছোঁয়ানো হলে সে সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে যেত। পঙ্গুও সুস্থ হয়ে উঠত। বোবা তার বাক্‌শক্তি ফিরে পেত।

মজার খবর

বরুণ মজুমদার

মাছের সঙ্গে বিমানের ধাক্কা

উড়ন্ত বিমানের সঙ্গে আকাশে শকুন বা চিলের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা মাঝে মধ্যে শোনা যায়। অনেক সময় এর ফলে বিমানের ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কথাও শোনা গেছে। কিন্তু উড়ন্ত বিমানের সঙ্গে আকাশে উড়ন্ত মাছের সংঘর্ষের কথা বড় একটা শোনা যায় না। অথচ বাস্তবে এই আশ্চর্যজনক ঘটনা সত্যিই ঘটেছে। আলাস্কা বিমানবন্দর থেকে যাত্রী নিয়ে একটা বিমান আকাশে উড়লো। যাত্রীবাহী ঐ বোয়িং বিমানের মুখে পড়লো একটা উড়ন্ত ঈগল। তার ঠোঁটে সদ্য শিকার করা একটা উড়ন্ত মাছ। সমুদ্রের ওপর থেকে ছোঁ মেরে মাছটা তুলে নিয়ে ঈগল অনেক উঁচুতে আকাশে উড়েছে। উদ্দেশ্য, মৌজ করে ঐ মাছটাকে খাওয়া। কিন্তু মাঝ আকাশে হঠাৎ ঐ বিমানটা উড়ে এসে তার সামনে পড়তেই ঈগল পাখিটা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। মুখ থেকে মাছটা ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। ঈগলের মুখ থেকে মুক্তি পেয়ে উড়ন্ত মাছটাও উড়ে এসে পড়লো বোয়িং বিমানের সামনে। ধাক্কা লাগলো বিমানের সঙ্গে মাছের। মাছটা তো মরলো নিশ্চয়ই, কিন্তু মাছের সঙ্গে ধাক্কায় সেই বিরাট বোয়িং বিমানের ককপিট ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কোনোরকমে যাত্রীদের নিয়ে বিমানটা আলাস্কা বিমানবন্দরেই আবার ফিরে এলো। নিরাপদে অবতরণ করলো। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীরা ছুটলেন বিমানের দিকে। যাত্রীরা অবশ্য অক্ষত। কারো কোনো আঘাত লাগেনি। বিমানচালকের দুশ্চিন্তা দূর হলো। ইঞ্জিনিয়াররা ছুটে এলেন বিমানের কাছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল বিমানের ককপিটের ক্ষতি হয়েছে। শুরু হলো ক্ষতিগ্রস্ত ককপিট মেরামতের কাজ। কিছুক্ষণ পরে আবার সব যাত্রীদের নিয়ে ঐ বোয়িং বিমানটা আকাশে উড়লো। যাত্রীদের সবার মুখে হাসি ফুটলো। এবার বিমানটা নিরাপদে গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছোলো। মাছের সঙ্গে আকাশে বিমানের ধাক্কা–কথাটা ভেবে সকলেই কিছুটা মজা উপভোগ করলেন।

আরশোলা প্রতিযোগিতা

পৃথিবীতে অনেক রকম বিচিত্র ধরনের প্রতিযোগিতার কথা শোনা গেছে। থুথু ছেটানো প্রতিযোগিতা, শামুক খাওয়া প্রতিযোগিতার কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কিন্তু যদি আরশোলা প্রতিযোগিতার কথা বলা হয় তবে নিশ্চয়ই অনেকে নড়েচড়ে বসবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমনি একটা অভিনব প্রতিযোগিতা হয়েছিল ১৯৮৭ সালের জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে। প্রতিযোগিতটা ছিল সবচেয়ে বড় আকারের আরশোলা আসরে উপস্থিত করা। মোট দু হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রণ করেছিলেন। প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বড় আরশোলাটা ছিল ৫.২ সেন্টিমিটার লম্বা। এই আরশোলাটার মালিক ছিলেন ১২ বছরের এক কিশোর। নাম–লেন স্নিডার। ১২ বছরের ছেলে অতবড় একটা আরশোলা ধরে এনে সকলকে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আর প্রথম পুরস্কার হিসাবে জিতে নিয়েছিল নগদ ১ হাজার ডলার।

নাসিকা গর্জনের রেকর্ড

নাক ডাকার ব্যাপারে বোধহয় সকলকে টেক্কা দিয়েছেন মেল সুইজার নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের নাক ডাকার ঠেলায় পাড়া-প্রতিবেশীরা রীতিমত অস্থির। ঘুমিয়ে তিনি যখন নাক ডাকেন, তখন মনে হয় ৫০ মিটার দূর দিয়ে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে। শব্দটা রীতিমত মাটি কাঁপানো! কাছাকাছি কোনো বাচ্চা ছেলে থাকলে ভিরমিও খেয়ে যেতে পারে। বাচ্চা তো বাচ্চাই, অনেক বয়স্ক লোক পর্যন্ত গভীর রাতে ওঁর নাক ডাকার বিকট শব্দে ভয়ে আঁতকে ওঠেন! মিস্টার সুইজারের নাক ডাকার শব্দের পরিমাণ কত জানো ? ৯০ ডেসিবেলের একটু কম অর্থাৎ ৮৭.৫ ডেসিবেল। পঞ্চাশ বছর বয়েসী এই ভদ্রলোক নাক ডাকায় এখন বিশ্বে

সবার সেরা। প্রতিবেশীরা অনেকে হয়তো তাঁর নাক ডাকার শব্দে বিরক্ত। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে একজন প্রতিবেশীও এ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ করেননি। তবে গত ১০ বছরে ১০ জন প্রতিবেশীও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আসেননি। এমনি তাঁর দুর্ভাগ্য। সাউদাম্পটনের কাছে যে হাউসিং এস্টেটে তিনি থাকেন, সেখান থেকে তিনি চলে যেতে চান একটা নির্জন জায়গাতে, যেখানে তাঁর বাড়ির আশেপাশে কোনো বাড়ি থাকবে না। নাক ডাকলে সেই বিকট শব্দে প্রতিবেশীরা কেউ জ্বালাতন হবেন না, শুধু বিরক্ত হবে কাঠবেড়ালীর দল। মিস্টার সুইজার তাঁর নাক ডাকার শব্দ কোনোদিন নিজের কানে শুনেছেন কিনা জানি না, তবে তিনি যে তাঁর নাসিকা গর্জনের ব্যাপারে অবহিত তাঁর কথাবার্তাতেই বোঝা যায়।

ছবিঃ সুফি

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি সাহিত্য প্রতিযোগিতার 'ক' বিভাগের (১০ বছর পর্যন্ত) প্রথম পুরস্কৃত লেখা

গল্পের রাজা

রীতেশ ঘোষ

বিবেকানন্দ অর্থাৎ স্বামীজী ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। ধর্মপ্রচারক হিসাবে দেশে বিদেশে তাঁর খ্যাতি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য তিনি। পরমহংসদেব মুখে মুখে গল্পের ছলে উপদেশ দিতেন, তা আমরা সকলেই জানি। বিবেকানন্দও গল্প বলার ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে গেছেন। সহজ সরল ভাষায় ছোট ছোট সরস কাহিনী বর্ণনা করতে তিনিও ছিলেন অতিশয় দক্ষ। গল্প বলার এই অসাধারণ পটুত্বের পিছনে হয়তো কয়েকটা কারণ থাকতে পারে। যেমন—

(১) মনের প্রচণ্ড ইচ্ছা (২) বাকপটুতা (৩) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশভঙ্গির প্রভাব (৪) বক্তব্যকে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের কাছে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা ও চেষ্টা।

যদিও কথাশিল্পী হিসাবে বিবেকানন্দ বিশেষ পরিচিতি লাভ করেননি তবু গল্প বলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ, ছিলেন গল্পের রাজা।

তাঁর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখাতেও তাঁর এই ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটবেলায় কোচোয়ানের মুখে পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্প শুনে শুনে তিনি নাকি একটি পক্ষিরাজ ঘোড়া কেনার কথা ভেবেছিলেন। রাজার গল্প শুনে বড় হয়ে রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই সময় তিনি ভাইবোন বন্ধুবান্ধবদের অনেক গল্প বলেছেন। যেমন—বাগদী স্ত্রীলোকের গল্প, ছাগলের গল্প ইত্যাদি। আর বলার ভঙ্গিটি এত সুন্দর যে থামলেই ভাইবোনেরা বলে উঠতেন, 'ও দাদা, তোর গল্প যে বড় ছোট্ট, এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল। আর একটা ভাল গল্প বল।' অমনি শুরু হতো আর একটা গল্প। সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা খুব বেশি ছিল। ক্লাস বসবার আগে বা পরে বা টিফিনের সময় তিনি বন্ধুদের এমন এমন গল্প বলতেন যাতে তারা হাসতে পারে। পরবর্তীকালে সন্ন্যাস জীবনেও গুরুভাইদের আধ্যাত্মিকতার ক্লান্তি দূর করবার জন্য জমিয়ে গল্প বলেছেন।

তবে আজেবাজে গল্প তিনি একদম পছন্দ করতেন না। প্রকৃত জটিল গল্পকে তিনি সহজ কথায় সুন্দরভাবে বলতেন। আমরা অনেকেই জানি বাঙালীর ছেলে বিজয়সিংহ অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সিংহল জয় করেছিলেন। তিনি সেই গল্পটিই বলেছিলেন এইভাবে—'একটা ছিল মহা দুষ্টু, বাঙালী রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ বলে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে, নিজের মতো কতকগুলো সঙ্গী জুটিয়ে জাহাজে করে ভেসে ভেসে লঙ্কা নামক টাপুতে হাজির।' তিনি যখন যে ধরনের গল্প বলতে চেয়েছেন ঠিক তার উপযোগী ভাষাও এসে গেছে। তাই তাঁর গল্পগুলো শ্রোতাদের কখনোই ক্লান্ত করে না। দরকার হলে গল্পের সঙ্গে কৌতুকরসও তিনি যোগান দিয়েছেন। তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

এক অহিংসা পরমো ধর্মের বাড়িতে ঢুকেছে চোর, কঠোর ছেলেরা তাকে পাকড়াও করে বেদম পিটছে। তখন কর্তা দোতলার বারান্দায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিসনি, মারিসনি, অহিংসা পরমো ধর্মঃ।'

বাচ্চা অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কি করা যায়?'

কর্তা আদেশ দিলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।'

চোর জোড় হাত করে বললে, 'আহা, কর্তার কি দয়া!'

গঙ্গাজল নিয়ে একটা মজার গল্প তিনি অনেকবার বলেছেন এবং শ্রোতারাও মজা পেয়েছে। গল্পটি এইরকম—

কোনো এক গঙ্গাহীন দেশে নাকি ছিল কলকাতার একটি ছেলের শ্বশুরবাড়ি। সেখানে খাবার সময় ছেলেটি দেখে চারিদিকে ঢাক ঢোল হাজির, আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার। তারপর দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া অমনি চারিদিকে ঢাক ঢোল বেজে উঠল। শাশুড়ী আনন্দাশ্রু পরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বাবা, তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়ো করা, তিনি গঙ্গা পেলেন।'

গল্পের রাজা ছিলেন বলেই বোধহয় এত অল্প কথায় এমন এক কাহিনী তিনি বলতে পেরেছেন।

আসলে ধর্মগুরুদের গল্প বলার ক্ষমতা থাকতেই হবে। মুখে মুখে ধর্মোপদেশ দিতে গেলে উপযুক্ত ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে হয়। নতুবা সাধারণের পক্ষে তা বোঝা শক্ত। তার ওপর গল্পগুলি যদি সরস হয় তাহলে সকল শ্রোতাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে এবং বক্তার মূল বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিবেকানন্দ ছিলেন এই বিশেষ গুণের অধিকারী। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত ভিত্তি আমাদের মধ্যে নেই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি একটি গল্প বলেছিলেন—

আমাদের দেশে কিছু নিরামিষভোজী আছেন। সকালবেলায় তাঁরা কয়েক পাউন্ড চিনি পিঁপড়ের আহার হিসাবে মাটিতে ছড়িয়ে দেন। এইভাবেই একদিন তাঁরা যখন মাটিতে চিনি ছড়াচ্ছেন তখন দৈবাৎ একজন কিছু পিঁপড়ে মাড়িয়ে ফেলেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, 'হতভাগা তুই পিঁপড়ে হত্যা করলি?' এই বলে তাঁকে তাঁরা এমন প্রহার করলেন যে তিনি মারা গেলেন।

এই যে বিশাল বিশ্ব তা চলছেই, তার জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। এ কথা বোঝাবার জন্য বিবেকানন্দ একটি ভূতের গল্প বলেছিলেন—

কোনো একজন লোক একটি ভূতকে চাকর হিসেবে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন সত্যি সত্যিই ভূতটিকে চাকররূপে পেল তখন আর তাকে কাজ দিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সে ভূতকে বলে একটা কুকুরের লেজ সোজা করে দিতে।

ঈশ্বরকে পেতে গেলে কেমন করে তাঁকে ডাকতে হয় সে বিষয় বোঝাবার জন্য যে গল্পটি বলেছিলেন সেটি এইরকম—

এক গুরুদেব তাঁর এক শিষ্যকে বললেন, 'ওহে বৎস, ভগবানকে খুব করে চাও, দেখবে ভগবান তখন না এসে পারবে না।' শিষ্য গুরুর কথা ঠিকমত বুঝতে পারল না। পরে একদিন গুরু শিষ্য উভয়েই নদীতে স্নান করতে গেলেন, তখন গুরুদেব বললেন, 'এবার ডুব দাও।' শিষ্য ডুব দিল। গুরু তখন শিষ্যকে জলের মধ্যে চেপে ধরলেন, কিছুতেই তাকে ওপরে মাথা তুলতে দিলেন না। শিষ্য জলের মধ্যে আঁকুপাঁকু করতে করতে যখন প্রায় অবশ হয়ে এল গুরু তখন তাকে মাথা তুলতে দিলেন। বললেন, 'কি বৎস, কেমন মনে হচ্ছিল?' শিষ্য বললো, 'ওঃ একটুখানি বাতাসের জন্য প্রাণটা একেবারে আঁকুপাঁকু করছিল।' গুরু বললেন, 'ঈশ্বরকে পেতে হলে তোমার এরকম হয় কি?' 'আজ্ঞে তা হয় না।' শিষ্যের এই উত্তরে গুরু বললেন, 'ঈশ্বর লাভের জন্য যে দিন তোমার ভিতরে এই রকম বোধ হবে সেই দিনই তুমি তাঁকে পাবে।'

এই ছিলেন গল্পের রাজা বিবেকানন্দ।

ছবি : বিজন কর্মকার

'ক' বিভাগের দ্বিতীয় পুরস্কৃত লেখা :

সাধনা—পলাশ গোস্বামী (ভেলাইগোড়া, মানবাজার, পুরুলিয়া)

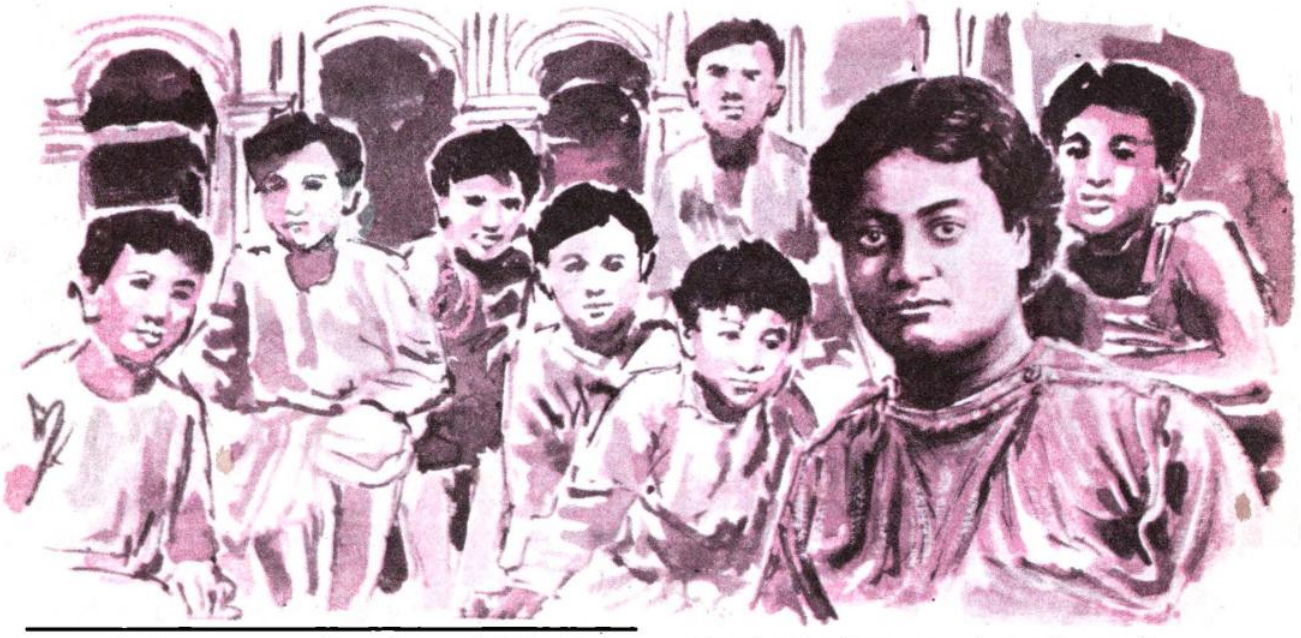

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি সাহিত্য প্রতিযোগিতার 'খ' বিভাগের (১১ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত) প্রথম পুরস্কৃত লেখা

প্রকৃত সর্দার

জয়দীপ গুহ

ইংরেজিতে একটা কথা আছে—Morning shows the day. কার ক্ষেত্রে কথাটা কতটা প্রযোজ্য জানি না, তবে বালক বিলের পরবর্তী জীবনে এর পূর্ণ প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করেছি, এ কথা অস্বীকার করবে কে? শিশু বিলে তাই একদিন বড় হয়ে বলতে পেরেছিলেন, 'ভুলিও না, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী... তোমার ভাই।'

শিশু বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে যে ভাব পরিস্ফুট ছিল তা হলো, 'He will lead others rather than follow'. হয়েছিলও তাই।

তাঁর জীবনপ্রারম্ভেই দেখা গেছে সমবয়স্কদের সঙ্গে দল বেঁধে খেলাধূলা করার সময়ে নরেন্দ্রই হতেন তাদের নেতা। 'রাজা-কোটাল' খেলায় তিনি বরাবরই রাজা সাজতেন। দত্তবাড়ির ঠাকুরদালানটি ছিল এক মানুষ উঁচু, দুটা সিঁড়ি পেরিয়ে সেখানে উঠতে হতো। নরেন্দ্র সদর্পে সর্বোচ্চ সোপানে বসে আর দু'জন সঙ্গীকে নিচের ধাপ দেখিয়ে বলতেন, 'তুমি হচ্ছো মন্ত্রী, আর তুমি হচ্ছো সেনাপতি। যাও, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও।' নিচের সিঁড়িতে বসত সভাসদরা। তারপর রাজদরবারে কাজ আরম্ভ হলে কোটাল এসে রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত। রাজা জিজ্ঞাসা করতেন, 'মন্ত্রী, রাজ্যের খবর কী?' মন্ত্রী কখনো বা সুখবর দিয়ে বলত, 'প্রজারা সুখে আছে,' আবার কখনো বা বলত,'মহারাজ, এক দস্যু বড় উৎপাত করছে।' অমনি রাজাদেশ বিঘোষিত হতো, 'যাও, দুরাত্মার মুণ্ডচ্ছেদ কর!'

তৎক্ষণাৎ দশ-এগারজন খেলুড়ে 'দুরাত্মাকে' ধরতে ছুটত। সেও কিছুতেই আত্মসমর্পণ করত না, ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে যেত। বাড়ির বিশ্রামরত চাকররা মাঝে মাঝে এতে ভীষণ বিরক্ত হলেও বালকদের মৌখিক তিরস্কারের বেশি তারা কিছু করতে পারত না। 'রাজা নরেন' শুধু মিটিমিটি হাসতেন।

কলকাতায় তখন সবে গ্যাসের আলো এসেছে, সোডা-লেমনেডের দোকান বসেছে। নরেন্দ্র অমনি কলকব্জা যোগাড় করে ফেললেন। বসল গ্যাসের ও সোডা-লেমনেডের কারখানা। এমনকি একটা রেলগাড়িও চলতে লাগল। কতকগুলো পুরানো দস্তার নল, মেটে হাঁড়ি ও খড় নিয়ে বাড়ির উঠোনে গ্যাসঘর নির্মাণ করলেন। বিজ্ঞের মতো গম্ভীর দৃষ্টিতে কোমরে হাত দিয়ে সব পর্যবেক্ষণ করতে করতে কখনো নিজের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হতেন, আবার কখনো বা তৃপ্ত না হয়ে বলতেন, 'না, এ কিচ্ছু হয়নি, আরো আগুন দে, খুব ফুঁ লাগা, গ্যাস বড় কম বেরুচ্ছে।'

নরেন্দ্র বন্ধুদের মধ্যে নেতা সাজতেন ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি কর্তৃত্বের মোহে সর্দার সাজতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার বলেছেন, 'শিরদার তো সর্দার।' বস্তুতঃ তিনি সঙ্গীদের জন্যে নিজ মস্তকদানে প্রস্তুত ছিলেন বলেই সর্দার হতে পেরেছিলেন। ছয় বছর বয়সের সময় তিনি এক খেলার সাথীকে নিয়ে চড়কের মেলা দেখতে যান। তাঁরা চড়ক থেকে একসঙ্গে মাটির মূর্তি কিনে ফিরছিলেন। সন্ধ্যে হয় হয়, বন্ধুটি একটু পিছনে পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ পিছন থেকে রব উঠল, 'গেল! গেল!' ফিরে দেখলেন নরেন্দ্র তাঁর বন্ধু ঘোড়ার গাড়ির তলায় যায় যায়। মুহূর্তে শিবের মূর্তি বগলদাবা করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে ছেলেটিকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন।

নরেন্দ্র একবার কুড়ি-পঁচিশ জন বালকের সঙ্গে কেল্লা দেখতে যান।

তাঁদের মধ্যে এক বালক পথে অসুস্থ বোধ করল। কেউ-ই বিশেষ গুরুত্ব দিল না, এমনকি নরেন্দ্রও না। হঠাৎ তারা খেয়াল করল, বালক প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। নরেন্দ্রই তখন তাকে একটা গাড়িতে তুলে বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। এই হলো প্রকৃত সর্দারের মানসিকতা।

সাত-আট বছরের বালক নরেন্দ্র একদিন কয়েকজন সহপাঠীকে নিয়ে নৌকারোহণে চাঁদপাল ঘাট থেকে মেটিয়াবুরুজে লক্ষ্ণৌ-এর নবাব আলি শাহ-র পশুশালা দেখতে যান। নৌকামধ্যে এক অসুস্থ বালক বমি করে ফেলে। বিরক্ত মাঝিরা বমি পরিষ্কারের দায়িত্ব বালকদের ঘাড়ে আরোপ করে। বালকদের মধ্যে নরেন্দ্র বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও নৌকা ভিড়বার সময়ে এক লাফে তীরে নেমে বন্ধুদের উদ্ধারের উপায় খুঁজতে লাগলেন। বিশ্বাসভরে নরেন্দ্র দুজন গোরা সৈনিককে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সব বোঝাতে লাগলেন। নরেন্দ্রর ব্যবহারে সন্তুষ্ট গোরা সৈনিকরা স্নেহবশতঃ নিজেদের ভাষায় বলল, 'ঠিক আছে বাছা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না।' তারাই মাঝিদের নৌকার বমি পরিষ্কার করতে আদেশ দিল। ভীত মাঝিরা তাদের আদেশ পাওয়ামাত্র ছেলেদের নির্বিবাদে নৌকা থেকে নামিয়ে দিল। নরেন্দ্রর ব্যবহারে সন্তুষ্ট সৈনিকরা তাকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইলেও নরেন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান করেন। সত্যি! সর্দারের মনোভাব বটে!

নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন দশ বছর তখন ইংলন্ডের সপ্তম এডওয়ার্ড ভারত পরিদর্শনে আসেন। সেই বছর সিরাপিস নামক ড্রেডনট জাতীয় একখনি বিরাট রণতরী কলিকাতা বন্দরে আসে। নরেন্দ্রর বন্ধুরা ধরে বসল তারা ওই জাহাজ দেখবে। নরেন্দ্রও সম্মত হয়ে সকলের জন্যে চললেন। কিন্তু জাহাজ দেখতে হলে চৌরঙ্গীতে এক সাহেবের ঘরে গিয়ে অনুমতি নিতে হবে। এদিকে ছোট ছেলে দেখে দারোয়ান তাদের তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সরিয়ে দিল, সাহেবের অফিসে যেতে দিল না। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি নরেন্দ্র সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি লক্ষ্য করলেন, সকলে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একখানি ঘরে যাচ্ছে আর সেখান থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। তাহলে ওটাই ওই সাহেবের ঘর! তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যে দোতলায় যাওয়ার জন্য বাড়ির পিছন দিকে আরেকটা দরজা আছে। সেটা একটা সরু ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। তিনি দারোয়ানের অলক্ষ্যে ঐ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন এবং প্রার্থীদের কাছে গিয়ে ক্রমে তাদের সঙ্গে ভিড়ে সাহেবের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সাহেব তাঁর আবেদনপত্রে সই করলে নরেন্দ্র স্মিতমুখে গিয়ে দারোয়ানের সামনে দাঁড়ালেন। বিস্মিত দারোয়ান প্রশ্ন করল, 'তুম ক্যায়সে উপর গয়া থা?' নরেন্দ্র সহাস্যে বললেন, 'হাম জাদু জানতা।' দারোয়ানের প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করে বন্ধুদের সঙ্গে সানন্দে জাহাজ দেখতে চললেন।

ছেলেবেলার আরো একটি ঘটনায় নরেন্দ্রর সাহস ও বিচারপ্রবণতার প্রকাশ আমরা পাই যা থেকে ভবিষ্যতে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার প্রমাণ মেলে। নরেন্দ্রর এক সহপাঠীর বাড়িতে এক চাঁপাফুলের গাছ ছিল। মাঝে মাঝে নরেন্দ্র সেই গাছের ডালে দোল খেতেন। সেই গৃহের গৃহকর্তা এবং নরেন্দ্রর সহপাঠীর বৃদ্ধ ঠাকুরদা বসুমহাশয়ের খুব ভীতির কারণ ছিল নরেন্দ্রর সেই দোল খাওয়া। বসু মহাশয় একদিন

নরেন্দ্রকে ডেকে বললেন, 'ও গাছে ব্রহ্মদৈত্যি আছে, তার ভয়ানক চেহারা। যারা ও গাছে চড়ে, তাদের ঘাড় মটকে দেয়।'

নরেন্দ্রর সঙ্গীসাথীরা এতে নিতান্ত ভয় পেলেও, নরেন্দ্র কিন্তু পিছু হটবার পাত্র নন। বন্ধুদের তিনি বললেন, 'তোরা সব গাধা। একজন একটা কথা বলে গেলেন, আর অমনি তা বিশ্বাস করতে হবে? যদি তাঁর কথা সত্য হতো তাহলে ব্রহ্মদৈত্য অনেক আগেই আমার ঘাড় মটকাত।'

প্রত্যূষের উজ্জ্বল রক্তিমাভা দেখে ভাবী দিবস সম্বন্ধে এক অভ্রান্ত ধারণা করা চলে, শৈশবের গুণাবলী দর্শনে ভাবী মঙ্গলময় জীবনেরও এক সুন্দর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। অন্তত নরেন্দ্রর ক্ষেত্রে তা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। ছেলেবেলার সর্দার বিলেই তাই পরবর্তীকালের স্বামীজী হয়েছেন। তাঁর ক্ষুদ্র অথচ কর্মবহুল জীবন যেন গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর, পথের বাঁকে বাঁকে অসংখ্য বৈচিত্র্য।

ছবি : বিজন কর্মকার

'খ' বিভাগের দ্বিতীয় পুরস্কৃত লেখা ঃ
সেকালের সর্দার—অম্লান ভট্টাচার্য (গৌহাটি-১২, অসম)

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি সাহিত্য প্রতিযোগিতার 'গ' বিভাগের (১৫ বছরের ঊর্ধ্বে) প্রথম পুরস্কৃত লেখা

পুণ্য প্রভাত

তাপস চক্রবর্তী

এলার্ম বাজল ঠিক ভোর চারটে আঠারোয়। মুখ-হাত ধুয়ে কয়েকটা ছোলা-বাদাম মুখের ভেতর ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম প্রতিদিনের মতো।

মাঠে পৌঁছেই দেখতে পেলাম হরিপদ স্যারকে। শুধু আজ নয় প্রতিদিনই স্যার আমার সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে অংশ নেন। বলে রাখি, আমার বিদ্যালয় জীবনের কাণ্ডারী গৃহশিক্ষক এই হরিপদ স্যার। হাঁটার মাঝে প্রতিদিনই একটা না একটা বিষয় স্যার আমাকে ছুঁড়ে দেন। আমি সেই বিষয়ে আমার মতামত দিয়ে থাকি। আজ দেখা হতেই স্যার বলে উঠলেন, তুই কি ভগবানে বিশ্বাস করিস? তোরা তো সব বিজ্ঞানের যুগের ছেলে, যুক্তি ছাড়া তোদের কাছে নাকি সব কিছুই অচল!

বুঝতে পারলাম স্যার আমাকে রাগিয়ে দিয়ে একটা জোরালো কোনো প্রসঙ্গে যেতে চাইছেন। প্রসঙ্গটা কী হতে পারে? হঠাৎ মনে পড়ল আজ ১১ই সেপ্টেম্বর, স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষপূর্তির পবিত্র দিন। বললাম, আমার কথা থাক স্যার। স্বামীজী যে মানুষের মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব দেখেছিলেন, এ কথা তো সত্যি?

স্যার বললেন, হ্যাঁ, তা সত্যি। কিন্তু ধর আজ পৃথিবীতে যারা বড় বড় দেশ চালাচ্ছে তারাও ভগবান আর তুই আজ একটু আগে মাঠের গেটের সামনে যে ভিখারীটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিস সেও ভগবান! তাহলে একজন দুর্গতি ভোগ করছে কেন?

—ধনবৈষম্য আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে একটা বিরাট সমস্যা আর এ ব্যাপারে তো স্বামীজী আমাদের বলে গেছেন, 'ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল জনসাধারণের দারিদ্র্য। আমাদের নিম্ন শ্রেণীর প্রতি কর্তব্য এই, কেবল তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।'

—বেশ। কিন্তু স্বামীজী কী ধরনের শিক্ষার কথা বলেছেন তা কি জানিস?

—একটু একটু জানি স্যার। যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় সেই শিক্ষার কথাই তিনি বলেছেন।

কথা বলতে বলতে আর মাঠটা ঘুরতে ঘুরতে কখন কুড়ি মিনিট কেটে গেছে ঘড়ি না দেখলে তা বুঝতে পারতাম না। স্যার আর খুব বেশিক্ষণ থাকবেন না। এদিকে আমার মনে তখন প্রশ্নের ভিড় জমে গেছে। আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম, স্বামীজী কিভাবে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন আমাদের? আপনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভাল বলতে পারবেন।

স্যার মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, শোন, এভাবে নিজেকে কক্ষণো ছোট ভাববি না। তুই আমার ছাত্র কিন্তু তাই বলে তুই যে আমার চেয়ে বেশি ভাল বলতে পারবি না তার কি কোনো মানে আছে? শোন, স্বামীজী বলেছেন, 'জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত।'

আমি বলে উঠলাম, আচ্ছা, স্বামীজী তো শিক্ষা বলতে মানুষের ভেতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ বলেছেন?

—ঠিক তাই। স্যার তাঁর ব্যক্তিত্বময় মুখটা আমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, ভারতের কল্যাণ যে স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভব নয় সে কথাও স্বামীজী বার বার বলেছেন। এক ডানায় যে পাখির ওড়া সম্ভব নয় তা তিনি জানতেন।

স্যারের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে গেল যখন ক্লাশ সেভেনে পড়ি তখন হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। স্যার রেজাল্ট হাতে নিয়ে বলেছিলেন, সেই যোগাসনের ক্লাবে যাচ্ছিস তো? নাকি শুধু বই মুখে করে বসে থাকিস? রোজ সকালে মাঠে আসবি, হাঁটবি, ছুটবি আমার সঙ্গে। স্বামীজী কি বলেছেন জানিস? বলেছেন, 'বজ্রের মত স্নায়ু আর লৌহের মত পেশী চাই।' বুঝলি?

সেই প্রথম দিনের মতো আজও স্যার স্বামীজীর ভাবে আমায় উদ্দীপ্ত করলেন। বললেন, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ কেমন হবে কোথায় হবে সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন স্বামীজী। আমাদের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় তা স্পষ্ট এবং বাস্তব ভাষায় বলেছেন। বলেছেন, কুসংস্কার মানুষের প্রবল শত্রু, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও জঘন্য। শিকাগো ভাষণে কুয়োর ব্যাঙের গল্প বলে ধর্মান্ধতা যে কি সাংঘাতিক তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আজ মাঠে এসেই তোকে জিজ্ঞেস করেছিলাম না তোর ভগবানে বিশ্বাস আছে কি না? আসলে আমার প্রশ্নটাই ছিল একটু গোলমেলে। স্বামীজী বলেছেন, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক। নিজের ওপর বিশ্বাস না এলে ঈশ্বরে

বিশ্বাস আসে না। আবার এই যে আজকাল চারদিকে দেখি চালাকির দ্বারা অনেক অনেক কিছুই পেতে চাইছে, কিন্তু তা কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। চালাকির দ্বারা কোনো বড় কাজ হয় না সে শিক্ষা স্বামীজী অনেক আগেই দিয়েছেন। আমাদের দেশের এই যে এত দুর্দশা এর সঠিক কারণটি খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি এবং স্পষ্ট ভাষায় তা বলেও গেছেন।

—কি কারণ স্যার? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—তিনি বলেছেন, 'বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেন্না করে করে তোরা এখন জগতে ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছিস।'

—স্যার, স্বামীজী তো বলেছেন, 'শরীর তো যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন যায়?' মরচে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা যে অনেক ভাল তা তিনি ভালই জানতেন।

স্যার বললেন, ঠিক তাই। আচ্ছা, তোর সেই লাইনগুলো মনে আছে? সেই যে ক্লাশ এইটে পড়ার সময় তুই একদিন স্বামীজীর লেখা একটা কবিতা চাইলি?

—হ্যাঁ স্যার, মনে আছে—

'জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ ভার এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
প্রেমভূমি চিতা মাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ, যাক মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা।

—বাঃ! খুব সুন্দর মনে রেখেছিস! কিন্তু তুই স্বামীজীর সেই কথাগুলো জানিস তো? শিক্ষা নিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, 'যদি শিক্ষা বলতে কতকগুলো বিষয় জানা মাত্র বোঝায়, তবে লাইব্রেরীগুলোই তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। অভিধান সমূহই তো ঋষি।'

—হ্যাঁ স্যার।

স্যার আবার বলতে লাগলেন, তারপর আমাদের কি আদর্শ হওয়া উচিত সে নিয়েও তিনি বলেছেন, 'আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে নিতে হবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করতে হবে।' স্বামীজী বার বার দুঃখ করে বলতেন, 'দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব উঠে, হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে!'

স্যারের চোখে যে জল এসে গেছে তা লক্ষ্য করলাম। স্যারের চোখে আমি কোনোদিন জল দেখিনি। বুঝলাম আজকের এই সকাল আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে গেছে। কানে ভেসে এল সেতারের শব্দ। প্রতিদিন হাঁটতে এসে এই শব্দ পাই। আজ যেন কেমন একটু অন্যরকম লাগল। সবকিছুর মধ্যেই যেন একটা বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা অনুভব করলাম। মনে হতে লাগল আমার ভেতরে আগুন জ্বলছে।

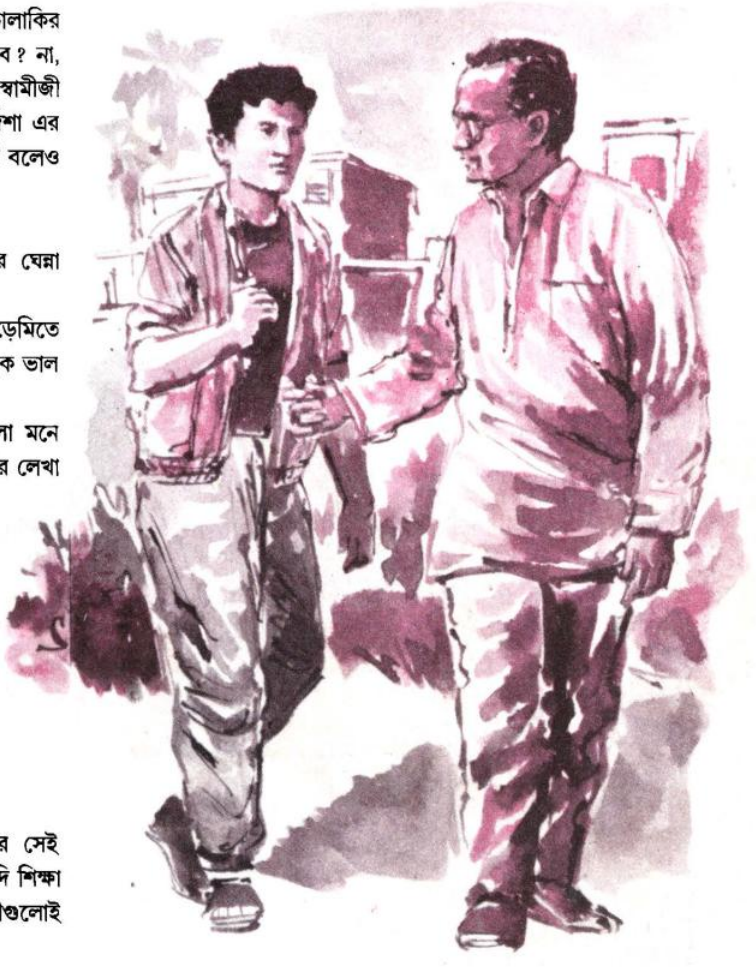

একটা কিছু করতে হবে, করতেই হবে আমাকে। স্যার যে আমার পাশে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছেন খেয়ালই ছিল না। খেয়াল হলো যখন স্যার বললেন, যা অনেক বেলা হয়ে গেল।

স্যার ধীরে ধীরে চলে গেলেন মাঠের গেট পেরিয়ে সুখেনদের দোকানের পাশ দিয়ে বাড়ির দিকে। আমার মনের ভেতর কে যেন বলতে লাগল,.. 'হে ভারত, ভুলিও না,..... তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না..... তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর..... বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই.....'

ছবি: বিজন কর্মকার

'গ' বিভাগের দ্বিতীয় পুরস্কৃত লেখা:
প্রকৃত শিক্ষক—চন্দ্রাণী বসু (৫২, বিনোদনগর, জোড়ামন্দির, কাঁচরাপাড়া)

প্রশ্ন :

১। ১৫১৩ সালে ভাসকো নুনেজ ডি বালবোয়া পানামা পেরিয়ে কি আবিষ্কার করেন ?

২। কোন দেশকে তার নিজেরই অনেক অঞ্চল অর্থ দিয়ে কিনতে হয় ?

৩। 'ঝুলতা মিনার' পর্যটকদের এত বিস্ময় জাগায় কেন ?

৪। পৃথিবীর প্রথম মোটর রেস কোথায় কবে হয় ?

৫। বন্ধু তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'অ্যাভনের রাজহংস'। বিখ্যাত এই মানুষটি কে ?

৬। আমাদের দেশে মাখনের তৈরি একটি মূর্তি আছে, সেটি কোথায় ?

উত্তর :

১। প্রশান্ত মহাসাগর।

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। ওই দেশের 'লুসিয়ানা টেরিটোরি' ছিল ফ্রান্সের অধীনে। ১৮০৩ সালে ইউরোপে যুদ্ধের খরচ যোগাতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৫ মিলিয়ন ডলারে ফ্রান্সের অংশ বিক্রি করে দেন। ফলে রাতারাতি যুক্তরাষ্ট্রের আকৃতি দ্বিগুণ হয়ে যায়। এরপর ১৮৫৩ সালে গিলা নদীর দক্ষিণে এক ফালি জমি ১০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র কেনে মেক্সিকোর কাছ থেকে। কথাবার্তা চালান মেক্সিকোর মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস গ্যাডসডেন। তবে সব থেকে লাভজনক ক্রয় হয় ১৮৬৭ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট উইলিয়াম এইচ সিওয়ার্ড রাশিয়ার কাছ থেকে ৭,২০০,০০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আলাস্কা কিনে নেন। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলেই সোনা ও তেল পাওয়া যায়।

৩। আমেদাবাদে সিদি বশিরার মসজিদে দুটি সুউচ্চ মিনার আছে। এদের বলে 'ঝুলতা মিনার'। এর একটা নড়তে আরম্ভ করলেই অপরটিও নড়তে বা দুলতে শুরু করে। লোকে বলে এই দুলুনির জন্যই মিনার দুটি ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাদের এই ধারণা সত্যি হতেও পারে। কিন্তু কি কারণে যে মিনার দুটি নড়ে তার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আজও কেউ দিতে পারেনি।

৪। ফ্রান্সে ১৮৯৪ সালে।

৫। উইলিয়াম সেক্সপিয়ার।

৬। চিশুলের (লাদাখ) কাছে ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত শাসিকোল গুম্ফায় বৌদ্ধদের পৌরাণিক এক চরিত্রের একটি মূর্তি আছে। ইয়াক গরুর দুধ থেকে প্রস্তুত মাখনের তৈরি এই মূর্তিটি ৩০ বছরের পুরনো। মূর্তিটি কখনো গলে যায় না কারণ ওখানকার তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ১২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ওপর ওঠে না আর শীতকালে তা নেমে যায় মাইনাস ৩০ ডিগ্রির নিচে।

ছবি : রাহুল মজুমদার

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেংগল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

নিউ বেঙ্গলের সাহিত্য সম্ভার

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিদেশিনী

অগ্নিমিত্রর
দেশ থেকে দেশান্তর

ডঃ দীপক চন্দ্রর
হরিবংশ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের **ক্রিকেট মাঠের বাইরে**

ক্রিকেট মাঠের বাইরে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। নেপথ্যে সেই সব ঘটনা খেলোয়াড়দের জীবনকে হাসি-কান্নার দোলায় দুলিয়ে দেয়। গল্প উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সেই সব কাহিনী নিয়ে এই প্রথম বাংলায় একটি বই বেরুলো।

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যর
পেরুতে সূর্য লাল

দিলীপ ভট্টাচার্যর
প্রবাস প্রেম

আভা বসুর
সাগর দুহিতা

দেবনারায়ণ গুপ্তর
বাংলার নট-নটী

শতদল ভট্টাচার্যর
নিশুতি রাতের মহাত্মা

ময়ূখ চৌধুরীর
দেবী দর্শন

ডাঃ কল্যাণ চক্রবর্তীর
বিপন্ন প্রকৃতি

রাধারমণ রায়ের
অদ্ভুত গোয়েন্দা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
(নতুন সংস্করণ)

ক্রিকেট খেলার আইন কানুন

ফুটবল খেলার আইন কানুন

ফুটবল ক্রিকেটের আইন

দীপঙ্কর বিশ্বাসের
মজানো দশ

অরুণ সর্দারের
অনাহূত

আশুতোষ মন্ডলের
নতুন আলো

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

Registration No. W. B./E. C.—60 October '93 "Suktara"

চুল পড়া ? অকালপক্কতা ? খুস্কি ?

চুল নিয়ে সমস্যা ?

এগুলি চুলের কোন রোগই নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। তাই সমাধানের জন্য মাথায় লাগানোর ওষুধের সঙ্গে সঠিক খাওয়ার ওষুধেরও প্রয়োজন।

.... ডাঃ সরকার

খুস্কি বিহীন, ঘন, কালো, মসৃণ চুল যদি চান, **আর্ণিকাপ্লাস** লাগান আর **ট্রায়োফার** খান।
এ দুটি চুল পড়া বন্ধ করে, চুলের পুষ্টি জোগায়, অকালপক্কতা রোধ করে, মাথার খুস্কি তাড়ায়।
মাথা ঠাণ্ডা রাখে, পেটের গোলমাল সারায়, চুলের উপাদান বাড়ায়, তাই নতুন চুল গজায়।
রূপ হয় অপরূপ হোমিওপ্যাথির ছোঁয়ায়, আর সুফল ছাড়া, কোনও কুফল না হয়।

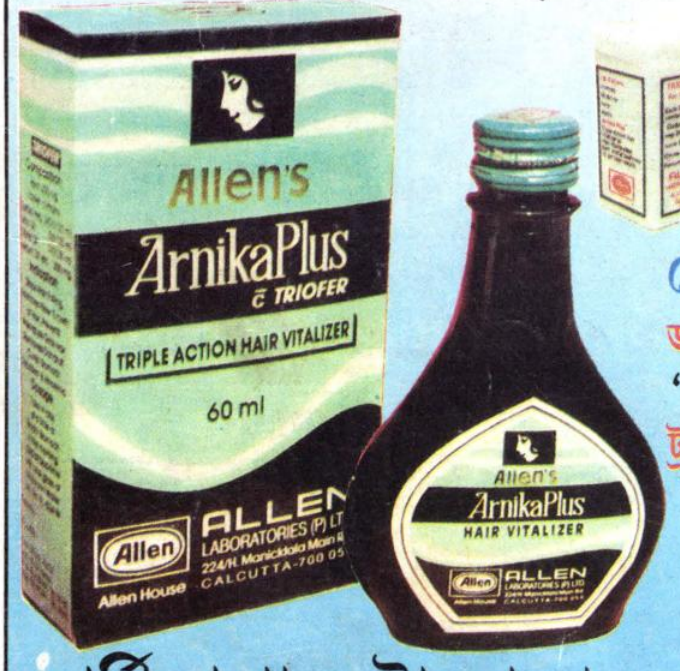

বিশ্বে সর্বপ্রথম

কেশ সমস্যা সমাধানে

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার—
"**আর্ণিকাপ্লাস**-তেলবিহীন হেয়ার লোশন ও
ট্রায়োফার ট্যাবলেট-হোমিও হেয়ার টনিক"
একই অভিনব প্যাকে।
প্যাক: ৬০ মিলি ও ১০০ মিলি।

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপল্ অ্যাকশন্ হেয়ার ভাইট্যালাইজার

কেশ সমস্যা সমাধানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হোমিও ওষুধ

ব্যবহার বিধি:

প্যাকের ভিতর দ্রষ্টব্য।

লিভোসিন নির্মাতাদের
সহযোগী সংস্থা Allen -এর
হোমিও গবেষণার একটি উপহার।

এ্যালেন ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ

এ্যালেন হাউস : কলি-৫৪, ফোন : ৩৬-৩০৯৬
এ্যালেন ভবন : কলি-৫৯ ফোন : ৫৯-৪০৫১ **যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।**

Jupiter
Emars Allen
allen's india
Dr. Sarkar Group

অ্যালোপ্যাথিক
আয়ুর্বেদিক
হোমিওপ্যাথিক
ওষুধ প্রস্তুতকারক

Marketed by :
Allen's India Marketing Pvt. Ltd.
ArnikaPlus Apartment, Sealdah
35, A. P. C. Road, Calcutta-9
Phone : 350-9026
Allen Apt : 351-0062

Allen's Ad. India